بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 2

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 7-8

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 17-23 ফেব্রুয়ারী, 2017 17-23 তবলীগ,1396 হিজরী শামসী ১৮-২৫ জামাদিয়াল আওয়াল 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

যে সেলসেলায় আব্দুল লতীফ শহীদ-এর ন্যায় সত্যবাদী ও ইলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তিকে খোদা সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি এই পথে প্রাণও কোরবানী করিয়া দিলেন এবং খোদার নিকট হইতে ইলহাম পাইয়া আমার সত্যায়ন করিলেন, এইরূপ সেলসেলার উপর আপত্তি উত্থাপন করা কি তাকওয়ার (খোদা-ভীরুতার) অন্তর্ভূক্ত? এক মিথ্যাবাদী মানুষের জন্য এক সৎ স্বভাব-বিশিষ্ট পুণ্যবান জ্ঞানী ব্যক্তির এইরূপ প্রেমের আবেগ কখনও হইতে পারে কি?

শহীদ আব্দুল লতীফ মরহূম খোদার ঐ সত্যবাদী ও মুত্তাকী বান্দা ছিলেন, যিনি খোদার পথে না নিজের স্ত্রীর পরোয়া করিলেন না, না সন্তান-সন্ততির পরোয়া করিলেন, না নিজের প্রিয় প্রাণের পরোয়া করিলেন। ইহারাই ন্যায়-নিষ্ঠ আলেম, যাহাদের কথা ও কর্ম অনুসরণের যোগ্য। শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত খোদার পথে নিজের সত্যবাদিতার চাহিদা পুরণ করেন।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

(১৭) সপ্তদশ নিদর্শন: মৌলবী সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ সাহেব শহীদের ইলহাম যে, এই ব্যক্তি সত্যবাদী এবং প্রতিশ্রুত মাহদী। ইহার সহিত ক্রমাগত কয়েকটি স্বপ্নও ছিল, যাহা উক্ত মৌলবী সাহেবকে ঐ দৃঢ়চিত্ততা দান করিয়াছিল যে, পরিশেষে তিনি আমার সত্যায়নের জন্য কাবুলের মাটিতে কাবুলের আমীরের হুকুমে প্রাণ দেন। কয়েকবার আমীর তাঁহাকে আহ্বান জানান যে, যদি তুমি এ ব্যক্তির বয়াত ছাড়িয়া দাও তবে পূর্বের চাইতেও তোমাকে অধিক সম্মান করা হইবে। কিন্তু তিনি বলেন, আমি প্রাণকে ঈমানের উপর প্রাধান্য দিতে পারি না। পরিশেষে তিনি এই পথে প্রাণ দেন এবং বলেন, এই পথে খোদার সন্তুষ্টির জন্য প্রাণ দেওয়া পসন্দ করি। তখন তাঁহাকে পাথর মারিয়া সঙ্গেসার (কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতিয়া পাথর মারিয়া হত্যা করা) করিয়া দেওয়া হয়। তিনি এইরূপ দৃঢ়-চিত্ততা দেখান যে, তাঁহার মুখ হইতে একটি উঃ শব্দও বাহির হয় নাই। চল্লিশ (৪০) দিন যাবৎ তাঁহার লাশ পাথরের নীপে পড়িয়া রহিল। অতঃপর নূর আহমদ নামক একজন শিষ্য তাঁহার লাশ দাফন করেন। তিনি বলেন, তাঁহার কবর হইতে এখনো মৃগনাভীর সুগন্ধ আসিতেছে। তাঁহার একটি চুল এখানে পৌঁছানো হইল। ইহা হইতে এখনো মৃগনাভীর সুগন্ধ আসিতেছে। ইহা আমার বায়তুদ দোয়ার (দোয়ার গৃহ) এক কোণায় একটি কাঁচের পাত্রের মধ্যে রক্ষিত আছে। এখন প্রতীয়মান হয় যে, যদি এই কাজ কেবল এক মিথ্যাবাদীর ধোঁকা হইত তবে কেন আমার সত্যবাদিতা সম্পর্কে এত দূরদূরান্ত এলাকা হইতে শহীদ মরহূমের উপর ইলহাম হইল এবং কেন তিনি ক্রমাগত ক্রমাগত স্বপ্ন দেখেন? তিনি তো আমার নাম সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন না। কেবল খোদা তাঁহাকে আমার সংবাদ দেন যে, পাঞ্জাবে প্রতিশ্রুত মসীহের জন্ম হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি পাঞ্জাবের খবরাখবর সম্পর্কে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। যখন তিনি জানিতে পারেন যে, প্রকৃতপক্ষে এক ব্যক্তি পাঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ানে প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবী করেন তখন সব কিছু ছাড়িয়া দিয়া তিনি আমার দিকে দৌড়াইয়া আসেন। তিনি প্রায় দুই মাস এখানে অবস্থান করেন। অতঃপর (দেশে) ফেরার পর দুষ্ট চরদের সংবাদের ভিত্তিতে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর যখন তাঁহাকে বলা হইল যে, নিজের স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আস তখন তিনি বলেন, এখন তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করার আমার প্রয়োজন নাই। আমি তাহাদিগকে খোদার নিকট সোপর্দ করিতেছি। যখন তাঁহাকে আদেশ শুনানো হইল যে, এখন তোমাকে সঙ্গেসার করা হইবে তখন তিনি বলেন, আমি চল্লিশ (৪০) দিনের বেশী মৃত থাকিব না। ইহা এই কথার প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে, যাহা খোদার কেতাবসমূহের লিখিত আছে যে, মোমেনকে মৃত্যুর কয়েক দিন পরে বা নেহায়েৎ চল্লিশ দিন পরে জীবিত করা হয় এবং আকাশের দিকে উঠাইয়া নেওয়া হয়। ইহা ঐ বিতর্কই যাহা আজ পর্যন্ত আমার ও আমার বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.)-এর 'রাফা' (আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত করন-অনুবাদক) সম্পর্কে চলিয়া আসিতেছে। আমি আল্লাহ্‌র কেতাব অনুযায়ী তাঁহার আধ্যাত্মিক 'রাফা' হওয়ায় বিশ্বাসী। কিন্তু তাহারা আল্লাহ্‌র কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এবং খোদার আদেশ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا(সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত:) (অর্থঃ তুমি বল, আমার প্রতিপালক পবিত্র। আমি কেবল একজন মানব-রসূল-অনুবাদক)-কে পদদলিত করিয়া দৈহিক 'রাফা' হওয়াতে বিশ্বাসী। আমাকে বলে যে, এই ব্যক্তি দাজ্জাল। কেননা, লেখা হইয়াছে যে, ত্রিশ (৩০) জন দাজ্জাল আসিবে। তাহারা চিন্তা করে না, যদি ত্রিশ (৩০) জন দাজ্জাল আসার কথাই ছিল তবে এই হিসাব অনুযায়ী প্রত্যেক দাজ্জালের মোকাবেলায় ত্রিশ (৩০) জন মসীহেরও আসা উচিত ছিল। ইহা কী গযব যে, দাজ্জাল তো ত্রিশ (৩০) জন আসিয়া গেল; কিন্তু মসীহ একজনও আসিলেন না। এই উম্মত কীরূপ হতভাগ্য যে, ইহাদের ভাগ্যে কেবল দাজ্জালই রহিয়া গেল এবং সত্য মসীহের মুখ দেখার এখনো সৌভাগ্য হইল না; অথচ ইসরাঈলী সেলসেলায় শত শত নবী আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

মোট কথা, যে সেলসেলায় আব্দুল লতীফ শহীদ-এর ন্যায় সত্যবাদী ও ইলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তিকে খোদা সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি এই পথে প্রাণও কোরবানী করিয়া দিলেন এবং খোদার নিকট হইতে ইলহাম পাইয়া আমার সত্যায়ন করিলেন, এইরূপ সেলসেলার উপর আপত্তি উত্থাপন করা কি তাকওয়ার (খোদা-ভীরুতার) অন্তর্ভূক্ত? এক মিথ্যাবাদী মানুষের জন্য এক সৎ স্বভাব-বিশিষ্ট পুণ্যবান জ্ঞানী ব্যক্তির এইরূপ প্রেমের আবেগ কখনও হইতে পারে কি?.............

সাহেবযাদা মৌলবী আব্দুল লতীফ শহীদ নিজের রক্ত দিয়া সত্যের সাক্ষ্য দিলেন। الاستقامت فوق الكرامت। (অর্থঃ দৃঢ়চিত্ততা কেরামত দেখানোর চাইতেও উৎকৃষ্ট-অনুবাদক)। কিন্তু আজিকার অধিকাংশ আলেমদের এই রীতি যে, দুই দুই টাকার বিনিময়ে তাহাদের ফতওয়া বদলাইয়া যায়। তাহারা খোদার ভয়ে নহে, বরং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু শহীদ আব্দুল লতীফ মরহূম খোদার ঐ সত্যবাদী ও মুত্তাকী বান্দা ছিলেন, যিনি খোদার পথে না নিজের স্ত্রীর পরোয়া করিলেন না, না সন্তান-সন্ততির পরোয়া করিলেন, না নিজের প্রিয় প্রাণের পরোয়া করিলেন। ইহারাই ন্যায়-নিষ্ঠ আলেম, যাহাদের কথা ও কর্ম অনুসরণের যোগ্য। শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত খোদার পথে নিজের সত্যবাদিতার চাহিদা পুরণ করেন।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন ২২ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১০-২১৩)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০ শে ফেব্রুয়ারীঃ হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সংক্রান্ত মহান ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণে (শিশুদের উদ্দেশ্যে)

মোসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) এর জীবনচরিত

মূল - আমাতুল কুদ্দুস
অনুবাদ - মোরতোজা আলী, বড়িশা

প্রিয় শিশুগণ! তোমরা অনেক বড় বড় লোকদের কাহিনী পড়ে থাকবে। আমি তোমাদের এই যুগের এক মহান ব্যক্তির কথা শোনাতে চাই। যার জন্মের পূর্বেই আল্লাহ্ মিঞা সংবাদ দিয়েছিলেন। শিশুগণ! এই কাহিনী আরম্ভ হয় ইং-১৮৮৬ সাল থেকে। এখন মনোযোগ দিয়ে শোন।হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মাওউদ (আঃ) ইং-২২শে জানুয়ারী ১৮৮৬ সালে হোশিয়ারপুর গমন করেন। সেখানে তিনি চল্লিশ দিন পর্যন্ত শেখ মেহের আলী সাহেব নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহের উপর তলায় অবস্থান করেন। সেই গৃহের নাম ছিল 'তবীলা'। এই চল্লিশ দিন অবস্থান কালে তিনি না কাহারও সাথে সাক্ষাৎ না কাহারও গৃহে গমন করেন। শুধু সারাদিন নীরবে খোদাতা'লার 'ইবাদাত' ও 'দোয়া' করতেন। এই সময়ে আল্লাহ মিঞা তাঁকে এক মহান সু-সন্তান দানের সংবাদ দেন।

ইং-২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সালে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) একটি ইস্তেহার লেখেন, যাতে ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ ছিল। আল্লাহ মিঞা তাঁকে এক মহান সন্তানের সু-সংবাদ দান করেন। শিশুগণ, মহানের অর্থ অনেক বড়। মহান তাকে বলে যে অনেক বড় বড় এবং ভালো ভালো কাজ করে আর যার চরিত্র মাধুর্যপূর্ণ হয়। সেই ভবিষ্যদ্বাণী আমি এখানে লিখছি, যাতে তোমরাও এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে সঠিক রুপে জ্ঞাত হতে পার।

মোসলেহ মাওউদ (রাঃ) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

"আমি তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী- তোমাকে একটি রহমতের নিদর্শন দিচ্ছি। আমি তোমার কান্না শুনেছি। এবং তোমার দোয়াসমূহকে অনুগ্রহ করে কবুল করেছি রবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর এবং লুধিয়ানা) তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি।

"সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বদান্যতা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হচ্ছো। হে বিজয়ী! তোমার প্রতি সালাম। খোদা বলেছেন, যারা জীবন-প্রত্যাশী, তারা যেন মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি লাভ করে এবং যারা কবরের মধ্যে প্রোথিত, তারা বের হয়ে আসে, যাতে ইসলামের মর্যাদা লোকের কাছে প্রকাশিত হয় এবং সত্যতার যাবতীয় আশিসসমূহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করেএবং মানুষ বুঝে যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং যারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম এবং কিতাব এবং তাঁর রসূলে পাক মহম্মদ (সাঃ) কে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করে থাকে, তারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন পায় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়।"সুতরাং, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর এক সুদর্শন এবং পবিত্র-পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত, তোমারই সন্তান হবে।"

"সুশ্রী, পবিত্র-পুত্র তোমার মেহমান আসছে। তার নাম আনমুয়ায়েল এবং সুসংবাদদাতাও বটে। তাকে পবিত্রাত্মা দেওয়া হয়েছে। সে কলুষ থেকে পবিত্র। সে আল্লাহর নূর। ধন্য, যে আকাশ থেকে আসে। তার সঙ্গে ফযল (বিশেষ কৃপা) আছে, যা তার আগমনের সাথে উপস্থিত হবে। সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে এবং তার সঞ্জিবনী-শক্তি ও পবিত্র আত্মার প্রসাদ বহুজনকে ব্যাধি মুক্ত করবে। সে 'কালিমাতুল্লাহ্'- আল্লাহ্তা'লার বাণী। কারণ খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাহাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করেছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান' এবং গাম্ভীর্যশীল হবে। জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে। সে তিনকে চার করবে (এর অর্থ বুঝি নি) সোমবার শুভ সোমবার। সম্মানিত মহৎ, প্রিয়-পুত্র।

"মাযহারুল হাক্কে ওয়া আ'লা কানাল্লাহা নাযালা মিনাস্ সামায়ে""অর্থাৎ সত্যের বিকাশ স্থল ও সুউচ্চ, যেন আল্লাহ্ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার আগমন বিশেষ কল্যাণময় হবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতিঃ আসছে, জ্যোতিঃ। খোদা তাকে তাঁর সন্তুষ্টির সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে নিজ আত্মদান করব এবং খোদার ছায়া তার মাথায় থাকবে। সে শীঘ্রই বর্ধিত হবে। বন্দীদের মুক্তির কারণ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে। জাতিরা তার কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করবে। তখন তার আত্মিক কেন্দ্র আকাশের দিকে উত্তোলিত হবে।

"ওয়া কানা আমরাম্মাকযিয়া" অর্থাৎ এটাই আল্লাহর অটল মিমাংসা" (ইশতেহার ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬)

শিশুগণ! এই সেই ভবিষ্যদ্বাণী যা হযরত মির্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ মোসলেহ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) সম্বন্ধে ছিল। খোদা তা'লা বলেন,- এই পুত্র, যার উল্লেখ ভবিষ্যদ্বাণীতে আছে আগামী নয় বছরের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করবে। হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর জন্মের পূর্ব্বে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছিল। যে অতি অল্প বয়সে মারা যায়। এতে শত্রুরা খুব খুশি হয়ে বল্‌ল তাঁর কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ মিঞার কথা কখনও মিথ্যা হয় না। আর এই ভবিষ্যদ্বাণী তো আল্লাহ মিঞার পক্ষ থেকে ছিল। সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) লিখলেন যে, -"দ্বিতীয় পুত্র যার সম্বন্ধে ঐশীবাণীতে বর্ণনা করা আছে যে, দ্বিতীয় বশীর দান করা হবে, যার অন্য নাম মাহ্মুদ। যদিও সে এখনও ইং-১৮৮৮ সালের ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত জন্ম গ্রহণ করেনি। কিন্তু, খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই জন্মাবে। পৃথিবী ও আকাশ স্থানচ্যুত হতে পারে কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘিত হওয়া অসম্ভব।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সবুজ রঙের কাগজে এক ইস্তেহার ছাপান যাকে সবুজ ইস্তেহার বলা হয়। তাতে তিনি লেখেন, মোসলেহ মাওউদের নাম ঐশী বাণীর বাক্যে 'ফযল' (অনুগ্রহ) রাখা হয়েছে।আর দ্বিতীয় নাম তার মাহমুদ আর তৃতীয় নাম দ্বিতীয় বশীর। আরও একটা ঐশী বাণীতে তার নাম ফযলে ওমর প্রকাশ করা হয়েছে।

পণ্ডিত লেখরাম যিনি হুযুরের খুব বড় বিরোধী ছিলেন, তিনি তার ইস্তেহারে লেখেন তিন বছরের মধ্যে আপনার সন্তান মারা যাবে আর কোন সন্তান বেঁচে থাকবে না। কিন্তু তার এই বাক্য মিথ্যা সাব্যস্ত হল।হযরত উম্মুল মোমেনীন নুসরাত জাঁহা বেগম (রাঃ) এর গর্ভে হযরত মির্যা বশীরুদ্দিন মাহ্মুদ আহমদ (রাঃ) ইং-১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ সালে শনিবার রাত ১০/১১টার নিকটবর্ত্তী সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন। শিশুগণ! স্মরণ থাকে হযরত মসীহ মাওউদ(আঃ) এর বিয়েহযরত নুসরাত জাঁহা বেগম (রাঃ) এর সাথে ঐশী বাণী অনুযায়ী হয়েছিল। এই বিয়ে থেকে মির্যা বশীরুদ্দিন মাহ্মুদ আহমদ (রাঃ) ছাড়া অন্যান্য সন্তানও জন্মগ্রহণ করেন। এর মধ্যে যারা দীর্ঘ জীবন লাভ করে তাদের নাম নিম্নরূপ-

১) হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ)
২) হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রাঃ)
৩) হযরত মোবারকা বেগম সাহেবা (রাঃ)
৪) হযরত আমাতুল হাফিয সাহেবা (রাঃ)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর এই সৌভাগ্যশালী সন্তানদের মধ্য থেকে এখন শুধু আমাতুল হাফিয সহেবা আমাদের মাঝে বিদ্যমান । সকল আহমদী তাঁর স্বাস্থ্য পূর্ণ জীবন লাভের জন্য দোয়া করেন। তোমরা ও তাঁর জন্য সর্বদা দোয়া কর । যাতে আল্লাহ মিঞা তাঁকে স্বাস্থ্য পূর্ণ জীবন দান করেন। হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর আকিকা অনুষ্ঠান দ্দক্রবার ইং- ১৮ই জানুয়ারী ১৮৮৯ সালে সম্পন্ন হয়। দীনা নামে এক নাপিত তার চুল কেটেছিল।

পুরানো বংশের মধ্যে প্রথা ছিল ছোট শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বয়স্কা মহিলা রাখা হত যাতে বাচ্চাদের সেবা যত্ন হয়। এই বয়স্কা মহিলাকে দাইমা বলা হয়। তার জন্য যে দাইমা রাখা হয় তিনি রোগগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি কাহাকেও বলেন নি আমি রোগগ্রস্ত। এই বয়স্কা মহিলা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ও হযরত উম্মুল মোমেনীন (রাঃ) কে না জিজ্ঞেস করে হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) কে দুধ পান করিয়ে দেন। এইভাবে তার মধ্যে গলগন্ড অসুখের জীবানু প্রবেশ করে। আর তার দু বছর বয়স থেকে বার তের বছর বয়স পর্যন্ত কখনও খুব বেশি কাশি হত কখনও জ্বর হত ও কখনও গলগন্ডের ফোঁড়া বলের মত হয়ে যেত। ডাক্তাররা বলত এই শিশুর বাঁচা খুব কঠিন। কিন্তু আল্লাহ মিঞা তাঁর দীর্ঘায়ূ হওয়া ও বিরাট বিরাট কর্মকান্ড করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই জন্য ডাক্তারদের নিরাশ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'লা স্বীয় করুণায় তাঁকে রক্ষা করেন। রাখে আল্লাহ মারে কে।হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাঃ) যেমন মা-বাপের আদরের পুত্র ছিলেন তেমনি তার শিক্ষা দীক্ষায় খুব যত্ন নেওয়া হত। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ও হযরত আম্মাজান (হযরত নুসরাত জাঁহা বেগম (রাঃ)) প্রথম থেকেই যত্নবান ছিলেন। যাতে তার শিক্ষা দীক্ষা এমন হয় যেন সে একজন ভাল মুসলমান হতে পারেও তার মধ্যে যথার্থ নৈতিকতা সৃষ্টি হয়। এইরূপে তার শিক্ষা দান করে ছোট ছোট ব্যাপারেও দৃষ্টি দেওয়া হত। এখানে আমি দু একটা ঘটনা উল্লেখ করছি যাতে অনুমান হয় তাঁর শিক্ষা দীক্ষা কিভাবে হয়েছে।

একদা শৈশবে তিনি একটা তোতা পাখি শিকার করে আনেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেণ, মাহমুদ এর মাংস হারাম (অবৈধ) নয়। কিন্তু আল্লাহতা'লা প্রত্যেক প্রানীকে ভক্ষন করার জন্য সৃষ্টি করেন নি কিছু কিছু প্রানী দর্শন করার জন্য কিছু কিছু প্রানীর স্বর আল্লাহ মিয়া সুমধুর কণ্ঠে সৃষ্টি করেছেন যা আমরা শুনি তৃপ্তি লাভ করি অর্থাৎ শৈশবে তাকে বলা হয়েছে কিছু কিছু জিনিস হারাম তো নয়, তবে ঐ

এরপর বারোর পাতায়....

জুমআর খুতবা

কিছু মানুষ মনে করে, ধর্ম এবং মাযহাব তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করে তাদের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন ধর্মীয় বিষয়ে তোমাদের উপর কোন কষ্টদায়ক বা অসহনীয় বিষয় চাপানো হয় নি; বরং শরিয়তের উদ্দেশ্য হল মানুষের বোঝা লাঘব করা। ইসলাম এমন এক ধর্ম, যা তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে এমন কোন নির্দেশ বা আদেশ-নিষেধ নেই, যা তোমাদেরকে সমস্যার মুখে ঠেলে দিতে পারে। বরং ছোট-ছোট থেকে শুরু করে বড়-বড় প্রতিটি নির্দেশ রহমত ও কল্যাণের কারণ হয়ে থাকে।

এমন কিছু বিষয় আছে যা আপাত দৃষ্টিতে অনেক তুচ্ছ হয়ে থাকে, কিন্তু সেগুলোকে তুচ্ছ বা সামান্য বিষয় মনে করার কারণে ক্রমেই সেগুলোর ফলাফল অত্যন্ত ভয়ানক রূপ ধারণ করে। তাই একজন মু'মিনের কখনোই কোন একটি নির্দেশকেও তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়।

যদি আমাদেরকে ধর্মে উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হয়, তাহলে ধর্মীয় শিক্ষা আমাদেরকে মেনে চলতে হবে। যদি আমরা এটি বলতে চাই যে, আমরা মুসলমান আর আমরা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহলে বিধি-নিষেধও অবশ্যই মেনে চলতে হবে; আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর কথা ও নির্দেশাবলীও অবশ্যই মেনে চলতে হবে। মহানবী (সা.) বলেছেন,লজ্জাবোধ ঈমানের অংশ। অতএব, শালীন পোষাক এবং পর্দা আমাদের ঈমানকে রক্ষা করার জন্য আবশ্যক।

প্রত্যেক আহমদী ছেলে-মেয়ে এবং নারী-পুরুষকে নিজেদের লজ্জাশীলতার মানকে উন্নত করে সমাজের নোংরামিথেকে মু ক্ত থাকার চেষ্টা করা উচিত। এ প্রশ্ন তৈরি হওয়া বা এটি নিয়ে হীনম্মন্যতার শিকার হওয়া উচিত নয় যে, পর্দা কেন আবশ্যক; কেন আমরা আঁটসাঁট জিনস আর ব্লাউজ পরতে পারব না? এটি পিতা-মাতার দায়িত্ব, বিশেষ করে মায়েদের দায়িত্ব যে, ছোটকাল থেকেই ছেলেমেয়েদের ইসলামী শিক্ষা এবং সমাজের পঙ্কিলতা সম্পর্কে অবহিত করা। কেবল তখনই আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর তথাকথিত উন্নত সমাজের বিষবাষ্প থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। এসব দেশে বসবাস করে সন্তান-সন্ততিকে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত রাখার জন্য এবং তাদের লজ্জা-সম্ভ্রম সুরক্ষিত রাখার জন্য পিতা-মাতার অনেক বড় সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা করার প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য নিজেদের উৎকৃষ্ট নমুনাও প্রদর্শন করতে হবে।

ইসলামবিরোধী অপশক্তিগুলো মুসলমানদের মধ্য থেকে ধর্মীয় শিক্ষা এবং মূল্যবোধকে ধ্বংস করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে। এরা এই অপচেষ্টায় লিপ্ত যে, ধর্মকে যেন বাকস্বাধীনতা আর ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে এমনভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যায় যে কেউ তাদের বিরুদ্ধে এই আপত্তি করতে না পারে যে, দেখ গায়ের জোরে ধর্মকে ধ্বংস করছে; বরং মানুষ যেন তাদেরকে সহানুভূতিশীল মনে করে

আমাদের আহমদীদের সবসময় স্মরণ রাখতে হবে যে, এই যুগ বড় ভয়াবহ যুগ। শয়তান চতুর্দিক থেকে ভয়াবহ হামলা করছে। যদি মুসলমানরা, বিশেষ করে আহমদী মুসলমানরা নারী-পুরুষ-যুবক নির্বিশেষে সকলেই ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা না করেন, তাহলে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই।

ইসলামের উন্নতির জন্য প্রত্যেক সেই বিষয় আবশ্যক এবং অবধারিত, যার নির্দেশ খোদা এবং তাঁর রসূল (সা.) দিয়েছেন। পর্দার কঠোরতা শুধু নারীদের জন্যই নয়। ইসলামী বিধি-নিষেধ কেবল নারীদের জন্যই নয়, বরং নর ও নারী উভয়কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা প্রথমে পুরুষদের শালীনতা এবং লজ্জাশীলতা ও পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন।

যদি মহিলাদের পুরুষের সাথে সাঁতার কাটার অনুমতি না থাকে তাহলে পুরুষদেরও মহিলাদের সাথে সাঁতার কাটার অনুমতি নাই।

সুতরাং এই সব বিধি-নিষেধ কেবল নারীদের জন্য নয়, বরং পুরুষদের জন্যও বটে। মহিলাদের দেখে পুরুষদেরকে দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দিয়ে নারীর সম্মানের সুরক্ষা করা হয়েছে। অতএব, ইসলামের প্রতিটি নির্দেশ প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ এবং পাপের আশঙ্কা থেকে মানুষকে মুক্ত করে।

মুরব্বীদের এবং তাদের স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে, তারাও যেন নিজেদের পোশাক এবং দৃষ্টি সংযত রাখার ক্ষেত্রে সাবধান থাকে। জামাত তাদের আদর্শ দেখে থাকে। মুরব্বী এবং মুবাল্লেগদের স্ত্রীরাও মুরব্বীই হয়ে থাকেন। তাদের সব বিষয়ে উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে **প্রদত্ত** ১৩ই জানুয়ারী, ২০১৬, **এর জুমুআর খুতবা (১৩ সুলাহ, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, কিছু মানুষ মনে করে, ধর্ম এবং মাযহাব তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করে তাদের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন- وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ (হাজ্জ:৭৯) অর্থাৎ, ধর্মীয় বিষয়ে তোমাদের উপর কোন কষ্টদায়ক বা অসহনীয় বিষয় চাপানো হয় নি; বরং শরিয়তের উদ্দেশ্য হল মানুষের বোঝা লাঘব করা। শুধু তাই নয়, বরং তাকে সকল প্রকারের সমস্যা এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষা করা। অতএব, খোদার এ নির্দেশে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ইসলাম এমন এক ধর্ম, যা তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে এমন কোন নির্দেশ বা আদেশ-নিষেধ নেই, যা তোমাদেরকে সমস্যার মুখে ঠেলে দিতে পারে। বরং ছোট-ছোট থেকে শুরু করে বড়-বড় প্রতিটি নির্দেশ রহমত ও কল্যাণের কারণ হয়ে থাকে। অতএব, এটি মানুষের চিন্তাধারার ভ্রান্তি, খোদার বাণী ভুল হতে পারে না। যদি

আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি হয়ে আমরা তাঁর নির্দেশাবলী অনুসারে জীবনযাপন না করি, তাহলে নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করব। মানুষ যদি বিবেক-বুদ্ধি না খাটায়, তাহলে শয়তান, যে কি-না প্রথম দিন থেকেই এই প্রতিজ্ঞা করে রেখেছে যে, আমি মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করব, সে মানুষকে ধ্বংসের গহ্বরে ঠেলে দিবে। অতএব, যদি শয়তানের হামলা থেকে মুক্ত থাকতে হয়, তাহলে খোদার নির্দেশাবলী মেনে চলা আবশ্যক। এমন কিছু বিষয় আছে যা আপাত দৃষ্টিতে অনেক তুচ্ছ হয়ে থাকে, কিন্তু সেগুলোকে তুচ্ছ বা সামান্য বিষয় মনে করার কারণে ক্রমেই সেগুলোর ফলাফল অত্যন্ত ভয়ানক রূপ ধারণ করে। তাই একজন মু'মিনের কখনোই কোন একটি নির্দেশকেও তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়।

আজকাল আমরা দেখি যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে পড়েছে। এর ফলে তাদের ভালোমন্দের মাপকাঠি ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ যুগে আমরা দেখি যে, স্বাধীনতা এবং ফ্যাশনের নামে সর্বত্র নারীপুরুষের মাঝে নগ্নতা ছড়িয়ে পড়ছে। প্রকাশ্যে নির্লজ্জ কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া হল উন্নত হওয়ার লক্ষণ। লজ্জাবোধ নামের কোন কিছু আর অবশিষ্ট নেই। আর জানা কথা যে, এর কুপ্রভাব আমাদের ছেলেমেয়েদের উপরও পড়বে, যারা এখানে তাদের মাঝেই বসবাস করে; আর কোন কোন ক্ষেত্রে তা পড়ছেও।

কতক মেয়ে যখন যৌবনে পদার্পন করে তখন আমাকে লিখে যে, 'ইসলামে পর্দা করা আবশ্যক কেন? কেন আমরা আঁটসাঁট জিনস এবং ব্লাউজ পরে বোরকা বা কোট ছাড়াই ঘর থেকে বাহিরে যেতে পারবনা; কেন আমরা এখানকার ইউরোপীয় স্বাধীন মেয়েদের মত পোষাক পরিধান করতে পারব না?'

প্রথম কথা হল, আমাদের সর্বদা স্মরন রাখতে হবে যে, যদি আমাদেরকে ধর্মে উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হয়, তাহলে ধর্মীয় শিক্ষা আমাদেরকে মেনে চলতে হবে। যদি আমরা এটি বলতে চাই যে, আমরা মুসলমান আর আমরা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহলে বিধি-নিষেধও অবশ্যই মেনে চলতে হবে; আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর কথা ও নির্দেশাবলীও অবশ্যই মেনে চলতে হবে। মহানবী (সা.) বলেছেন,লজ্জাবোধ ঈমানের অংশ। (বুখারী, কিতাবুল ঈমান)

অতএব, শালীন পোষাক এবং পর্দা আমাদের ঈমানকে রক্ষা করার জন্য আবশ্যক। উন্নত বিশ্ব যে স্বাধীনতা এবং উন্নতির নামে লজ্জাশীলতাকে জলাঞ্জলী দিচ্ছে তার কারণ হল, এরা ধর্ম থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এক আহমদী মেয়ে যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছে, সে অঙ্গীকার করেছে যে, আমি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেব। এক আহমদী ছেলে যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মেনেছে, এক আহমদী পুরুষ বা মহিলা যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মেনেছে, সে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। আর এই প্রাধান্য তখন প্রদান করা হবে, যখন সে ধর্মের শিক্ষা অনুসারে আমল করবে। এটিও আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রতিটি কথা আমাদের সম্মূখে খোলাসা করে বর্ণনা করেছেন, পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। এই পর্দাহীনতা এবং নির্লজ্জতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি লিখেন-

"মানুষ ইউরোপের মত পর্দাহীনতার উপর জোর দিচ্ছে, কিন্তু এটি কখনোই উচিত নয়। এই লাগামহীন নারী-স্বাধীনতাই অবাধ্যতা, অনাচার ও কদাচারের মূল। যেসব দেশ এমন লাগামহীন স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে তাদের নৈতিক অবস্থার কথা একটু ভাব। যদি তাদের লাগামহীন স্বাধীনতা এবং পর্দাহীনতার কার ণে তাদের সম্ভ্রম ও পবিত্রতার মান উন্নত হয়ে থাকে, তাহলে আমরা মেনে নেব যে আমরা ভ্রান্তিতে রয়েছি। কিন্তু একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে যখন নরনারী যৌবনে থাকবে আর একই সাথে স্বাধীনতা এবং পর্দাহীনতাও থাকবে, তখন তাদের সম্পর্ক কতটা ভয়াবহ হবে! বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কুদৃষ্টি এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় পরাস্ত হওয়া মানুষের বৈশিষ্ট্য। তাহলে অবস্থা যখন এমন হবে যে পর্দার ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা রয়েছে; মানুষ অনাচার, কদাচার এবং দুর্বৃত্তে লিপ্ত– তো এমন পরিস্থিতিতে লাগামহীন স্বাধীনতা থাকলে কী না হবে? পুরুষদের অবস্থা একটু ভাব যে তারা কেমন লাগমহীন ঘোড়ার মত হয়ে গেছে। না আছে খোদার ভয়, আর না আছে পরকালের বিশ্বাস। জাগতিক ভোগবিলাসকে নিজেদের মাবুদ বানিয়ে রেখেছে। তাই সর্বপ্রথম যা আবশ্যক তা হল, এই স্বাধীনতা ও পর্দাহীনতার পূর্বে পুরুষদের চারিত্রিক অবস্থার সংশোধন কর। যদি এর সংশোধন হয়ে যায়; যদি পুরুষদের ভিতর এতটা শক্তি এসে যায় যার ফলে তারা রিপুর তাড়নার শিকার হবে না , তখন এ বিতর্কের সূত্রপাত করতে পার যে, পর্দা আবশ্যক, না-কি আবশ্যক নয়? নতুবা বর্তমান পরিস্থিতিতে এ কথার উপর জোর দেওয়া যে, স্বাধীনতা চাই, পর্দার প্রয়োজন নেই– এটি বাঘের সামনে ছাগল উপহার দেওয়ার নামান্তর। এদের কী হয়েছে যে এরা কোন কথার পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে না? অন্ততপক্ষে নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি খাটাক যে পুরুষদের কি এতটা সংশোধন হয়ে গেছে যে, মহিলাদেরকে তাদের সামনে পর্দাহীনভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে?"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৪-১৩৫)

আজকের সমাজে যে সমস্ত পাপ আমাদের চোখে পড়ে, তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যেকটি শব্দের সত্যায়ন করে। অতএব, প্রত্যেক আহমদী ছেলে-মেয়ে এবং নারী-পুরুষকে নিজেদের লজ্জাশীলতার মানকে উন্নত করে সমাজের নোংরামি থেকে মু ক্ত থাকার চেষ্টা করা উচিত। এ প্রশ্ন তৈরি হওয়া বা এটি নিয়ে হীনম্মন্যতার শিকার হওয়া উচিত নয় যে, পর্দা কেন আবশ্যক; কেন আমরা আঁটসাঁট জিনস আর ব্লাউজ পরতে পারব না? এটি পিতা-মাতার দায়িত্ব, বিশেষ করে মায়েদের দায়িত্ব যে, ছোটকাল থেকেই ছেলেমেয়েদের ইসলামী শিক্ষা এবং সমাজের পঙ্কিলতা সম্পর্কে অবহিত করা। কেবল তখনই আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর তথাকথিত উন্নত সমাজের বিষবাষ্প থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। এসব দেশে বসবাস করে সন্তান-সন্ততিকে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত রাখার জন্য এবং তাদের লজ্জা-সম্ভ্রম সুরক্ষিত রাখার জন্য পিতা-মাতার অনেক বড় সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা করার প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য নিজেদের উৎকৃষ্ট নমুনাও প্রদর্শন করতে হবে।

সম্প্রতি এক মেয়ে আমাকে পত্র লিখেছে যে, 'আমি অনেক পড়ালেখা করেছি, ব্যাংকে ভালো চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি জানতে চাই, সেখানে যদি পর্দা এবং হিজাবের উপর বিধি-নিষেধ থাকে আর কোটও যদি পরিধানের অনুমতি না থাকে, তাহলে কি আমি এ চাকরি করতে পারব? কাজ থেকে বেরিয়েই পর্দা করব।' সে লিখেছে, 'আমি শুনেছি যে আপনি বলেছেন, যে সমস্ত মেয়েরা চাকরি করে তাদের চাকরিস্থলে তারা বোরকা বা হিজাব শিথিল করে কাজ করতে পারে।' এই মেয়ের ভিতর এতটা সততা রয়েছে যে সে একইসাথে একথাও লিখেছে যে, আপনি নিষেধ করলে আমি চাকরি করব না।আমি যদি এটি বলে থাকি (তবে তা কোন ক্ষেত্রে বলেছি তা) আমি ব্যাখ্যা করছি, (কারণ) একজন নয় বেশ কয়েকটি মেয়ে এই প্রশ্ন করেছে। প্রথম কথা হল, অনেক ক্ষেত্রে, অনেক পরিস্থিতিতে ডাক্তারদের সীমাবদ্ধতা থাকে; সেখানে প্রথাগত বোরকা বা হিজাব পরে কাজ করা সম্ভব নয়। যেমন, অপারেশনের সময় তাদের পোষাক এমন হয়ে থাকে যে, মাথায় টুপি থাকে, মাস্ক থাকে আর ঢিলাঢালা গাউন পরিধান করে। এই সময়টি ছাড়া ডাক্তাররাও পর্দার ভেতর থেকে কাজ করতে পারে। রাবওয়াতে আমাদের ডাক্তার ফাহমিদা সাহেবা ছিলেন, আমরা তাকে সবসময় পর্দা করতে দেখেছি। ডাক্তার নুসরাত জাহান সাহেবাও ছিলেন, তিনি খুব ভালো পর্দা করতেন। তিনি ইংল্যান্ডেও পড়ালেখা করেছেন আর প্রত্যেক বছর নতুন গবেষণা অনুসারে যোগ্যতার মানকে উন্নত করার জন্য লন্ডনেও আসতেন, কিন্তু সবসময় পর্দার করেছেন। বরং তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত পর্দার অনুশাসন মেনে চলতেন। এখানকার কোন ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে কখনো আপত্তি করে নি, তার কাজ সম্পর্কে কেউ আপত্তি করতে পারে নি আর তার পেশাদারী দক্ষতাও এতে প্রভাবিত হয় নি। তিনি অনেক বড় বড় অপারেশনও করেছেন। তাই যদি সদিচ্ছা থাকে, তবে ধর্মীয় শিক্ষা মেনে চলার পথও খুজে পাওয়া যায়।

অনুরূপভাবে নারী গবেষকদের আমি বলেছিলাম, কোন মেয়ে যদি এত মেধাবী হয় যে সে গবেষণা করে, আর গবেষণাগারে তাকে বিশেষ পোষাক পরিধান করতে হয়, তাহলে সেখানে সে হিজাব না নিয়েও সেই পরিবেশের পোষাক পরিধান করতে পারে। সেখানেও তারা টুপি ইত্যাদি পরে থাকে। কিন্তু বাহিরে বের হবার সাথে সাথেই ইসলাম যেমন নির্দেশ দিয়েছে সেরকম পর্দা করা উচিত। ব্যাংকের চাকরি এমন কোন চাকরি নয়যার মাধ্যমে মানবতার সেবা হচ্ছে। তাই সাধারণ চাকরির ক্ষেত্রে, যেখানে মেয়েরা দৈনন্দিন পোষাক এবং মেকাপের মাঝে থাকে এবং সেখানে কোন বিশেষ পোষাক পরতে হয় না, এমন চাকরিস্থলের জন্য পর্দা শিথিল করা বা পর্দা না করার অনু মতি দেয়া যেতে পারে না। তাই স্মরণ রাখতে হবে যে, লজ্জাবোধের সুরক্ষার জন্য শালীন পোষাক পরিধান করা আবশ্যক। আর পর্দার যে প্রচলিত রীতি

রয়েছে তা শালীন পোষাকেরই একটি রূপ। আপনি যদি পর্দায় শৈথল্য দেখান, তাহলে নানা অজুহাত-বাহানা করে শালীন পোষাকও আপনি সংক্ষিপ্ত করতে থাকবেন, আর এই সমাজের স্রোতে বয়ে যাবেন যেখানে আগে থেকেই নির্লজ্জতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তুজগতের মানুষ অনেক আগে থেকেই এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত যে, যারা নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষা অনুসরণ করে, বিশেষ করে যারা মুসলমান, তাদেরকে কিভাবে ধর্ম থেকে দূরে ঠেলে দেয়া যায়। সুইজারল্যান্ডে এক মেয়ে মামলা করে যে, আমি ছেলেদের সাথে সাঁতার কাটতে অস্বস্তি বোধ করি; স্কুল আমাকে ছেলেদের সাথে একত্রে সাঁতারে বাধ্য করে; আমাকে পৃথকভাবে কেবল মেয়েদের সাথে সাঁতরানোর অনুমতি দেওয়া হোক। মানবাধিকার কর্মীরা, যারা মানবাধিকারের বড় পতাকাবাহি সাজে, তারা বলে, 'তুমি পৃথক সাঁতার কাটতে চাও, তোমার সেই ব্যক্তিগত অধিকার আছে; কিন্তু এটি এমন বড় কোন ইস্যু নয়,যার জন্য তোমার পক্ষে রায় দেয়া যেতে পারে।' যেখানে ইসলামী শিক্ষা বা নারীদের লজ্জাশীলতার প্রশ্ন আসে, সেখানে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন অজুহাত দেখানো শুরু করে। এমন পরিস্থিতিতে আহমদীদের পূর্বের চেয়ে বেশি সাবধান হতে হবে। স্কুলে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য যদি সাঁতার কাটা আবশ্যক হয়ে থাকে, কোন কোন দেশে এমনটি রয়েছে; তাহলে মেয়েরা সাঁতারের পুরো পোষাক, আজকাল যেটিকে বুর্কিনি বলা হয়, তা পরিধান করে সাঁতার কাটবে। কিন্তু এই ছাড় কেবল ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য, যেন তাদের মাঝে এই সচেতনতা সৃষ্টি হয় যে, আমাদেরকে শালীন পোষক পরিধান করতে হবে। পিতা-মাতার উচিত সন্তানদেরকে বোঝানো যে, ছেলে এবং মেয়েদের সাঁতার পৃথক পৃথক স্থানে হওয়া উচিত। আর এর জন্য যতটা সম্ভব চেষ্টাও করা উচিত।

ইসলামবিরোধী অপশক্তিগুলো মুসলমানদের মধ্য থেকে ধর্মীয় শিক্ষা এবং মূল্যবোধকে ধ্বংস করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে। এরা এই অপচেষ্টায় লিপ্ত যে, ধর্মকে যেন বাকস্বাধীনতা আর ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে এমনভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যায় যে কেউ তাদের বিরুদ্ধে এই আপত্তি করতে না পারে যে, দেখ গায়ের জোরে ধর্মকে ধ্বংস করছে; বরং মানুষ যেন তাদেরকে সহানুভূতিশীল মনে করে; শয়তানের মত উপরে উপরে সাধু সেজে ধর্মের ওপর হামলা করা চাই। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, এ যুগে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের উপর ন্যাস্ত হয়েছে;আর এর জন্য আমাদেরকে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে, আর কষ্টও সহ্য করতে হবে। আমরা তাদের সাথে ঝগড়া বিবাদে তো লিপ্ত হব না, কিন্তু বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদের সাথে বোঝাপড়াও করতে হবে। আজকে আমরা যদি তাদের এমন একটি কথা মেনে নিই যার সম্পর্ক আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার সাথে, তাহলে ধীরে ধীরে আমাদের অনেক কথা আর অনেক শিক্ষার উপর বিধি-নিষেধ আরোপিত হতে থাকবে। আমাদের দোয়ার উপরও জোর দিতে হবে যেন খোদা তা'লা আমাদেরকে এসমস্ত শয়তানী ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করার শক্তি এবং মনোবল দান করেন এবং আমাদের সাহায্য করেন। যদি আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, আর অবশ্যই আমরা সত্যের উপরই রয়েছি; তাহলে একদিন আমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবি। ইসলামী শিক্ষাই পৃথিবীতে জয়যুক্ত হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

"সত্যের ভেতর এক সৎ সাহস এবং বীরত্ব থাকে, মিথ্যাবাদী ভীরু হয়। যার জীবন অপবিত্রতা এবং নোংরা পাপে কলুষিত, সে সবসময় ভীত-ত্রস্ত থাকে আর মোকাবেলা করার সাহস রাখে না, সে এক সত্যবাদী মানুষের মত বীরত্ব এবং সাহসিকতার সাথে নিজের সত্যতা প্রকাশ করতে পারে না আর নিজের পবিত্রতার প্রমাণ দিতে পারে না। জাগতিক বিষয়েই তোমরা চিন্তা করে দেখ– এমন কে আছে যাকে আল্লাহ্ তা'লা সামান্য সচ্ছলতা দান করবেন আর তার হিংসুক থাকবে না? প্রত্যেক সঙ্গতিশীল ব্যক্তির অবশ্যই হিংসুক থাকেই আর তার পিছনেই লেগে থাকে। ধর্মীয় বিষয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। শয়তানও সংশোধন এবং পুণ্যের শত্রু। তাই মানুষের নিজের হিসাব পরিষ্কার রাখা উচিত;খোদার সাথে তার লেনদেন যেন স্বচ্ছ ও সঠিক হয়, আল্লাহ্কে যেন সন্তুষ্ট করে, আর কাউকে যেন ভয় না করে বা কারো প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে; এমন বিষয় এড়িয়ে চলা উচিত যার ফলে সে নিজেই শাস্তির শিকার হতে পারে। কিন্তু এগুলোর কোনটিইঅদৃশ্য সত্তার সাহায্য এবং খোদা প্রদত্ত তৌফিক ছাড়া সম্ভব নয়। নিছক মানবীয় প্রচেষ্টা কোন কিছু করতে পারে না, যতক্ষণপর্যন্ত খোদার কৃপা সাথী না হয়। خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا (নিসা:২৯) মানুষ অক্ষম ও দুর্বল, ভুল ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ, চতুর্দিক থেকে সমস্যা কবলিত। তাই দোয়া করা উচিত যেন খোদা তা'লা পুণ্যের তৌফিক দেন আর তাকে অদৃশ্য সাহায্য ও কৃপারাজির উত্তরাধিকারী করেন।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫২)

সুতরাং দোয়ার মাধ্যমে পৃথিবীবাসীকে আমাদের মানাতে হবে। এর জন্য খোদার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, অন্যান্য ধর্ম চিরস্থায়ী নয়। সেগুলো নিজ নিজ সময়ে এসেছে আর নিজযুগের শিক্ষামূলক চাহিদা পূরণ করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেই কারণে তাদের ধর্মীয় পুস্তকাবলীতে অনেক পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেছে। কিন্তু ইসলাম, যা আজ পর্যন্ত সুরক্ষিত ও অবিকৃত রয়েছে, তা চিরস্থায়ী ধর্ম; কুরআনী শিক্ষামালা চিরকালের জন্য। তাই আমাদের কোন প্রকার হীনম্মন্যতার শিকার না হয়ে নিজেদের শিক্ষার ওপর আমল করার চেষ্টা করা উচিত এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত। অন্যদেরও বলা উচিত যে, তোমরা যেসব কথা বল তা খোদার ইচ্ছার পরিপন্থী এবং ধ্বংসের পথে পরিচালনাকারী।

ইসলাম এমন কোন ধর্ম নয় যা উদ্ভট বিধি-নিষেধের শিকলে মানুষকে আবদ্ধ করবে। প্রয়োজন অনুসারে এর শিক্ষায় ছাড়ও রয়েছে। যেভাবে আমি বলেছি যে, ডাক্তারদের জন্য, রোগীদের জন্য; কিছু রোগী এমন থাকেন যাদেরকে পুরুষ ডাক্তারকে দেখাতে হয়, এসব ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে। মানব জীবন রক্ষা এবং মানব জীবনকে কষ্টমু ক্ত করা হল এর প্রধান উদ্দেশ্য। এ কারণেই সমস্যার সময় বা বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে মৃত প্রাণী বা শুকরের মাংস খাওয়ারও অনুমতি রয়েছে, কিন্তু কেবল জীবন রক্ষার প্রয়োজনে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন ঔষধে এলকোহল ব্যবহার হয়। কিন্তু শয়তানী অপশক্তি আমাদের যেভাবে পরিচালিত করতে চায় তখন তার উদ্দেশ্য থাকে ধীরে ধীরে ধর্মীয় সীমারেখা মুছে দেওয়া এবং ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করা। আর এর বিরুদ্ধে আমাদের আহমদীদেরকেই জিহাদ করতে হবে। আর এটি তখন সম্ভব হবে যখন আমরা ইসলামী শিক্ষাকে সবকিছুর উপর গুরুত্ব দেব এবং আমরা খোদার সামনে নতজানু হব যেন আমাদের সাফল্য আসে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে তরবারির কোন জিহাদ নেই, বরং প্রবৃত্তির সংশোধনের জিহাদ রয়েছে। বিশেষভাবে এসব উন্নত বিশ্বে বসবাসকারী মুসলমান আর সারা পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেক মুসলমান, বিশেষ করে আহমদী মুসলমানদের উদ্দেশ্যেই আমার বলা– তাদেরকে দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার আর যেকোন প্রকারে দেশের উন্নতির জন্য সেবা করার ক্ষেত্রে উন্নত মানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এটি যদি হয়, তাহলে শয়তানী অপশক্তির মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। তারা একথা বলতে বাধ্য হবে যে, এসমস্ত মুসলমান তারা, যারা দেশ ও জাতিকে উন্নতি-অগ্রগতির প্রকৃত গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সচেষ্ট থাকে; এরা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী নয়। এদেরকে এবং বিভিন্ন সরকারকে মানাতে হবে যে, যদি আমরা আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার কারণে কোন বিষয়ে নিজেদের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করি বা কোন কিছু মেনে চলি, তাহলে সরকার বা আদালতের সেই বিষয়ে নাক গলানোর কোন দরকার নেই; নতুবা এর ফলে অশান্তি এবং অস্বস্তি হৃদয়ে দানা বাঁধবে, স্থানীয় লোকদের এবং অভিবাসীদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হবে; যদিও যাদেরকে তারা অভিবাসী বলে তাদের দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্ম এখন এখানে বসবাস করছে। হ্যাঁ, যদি দেশের কোন ক্ষতি করে, দেশের সাথে যদি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করে, দেশে যদি মিথ্যা এবং ঘৃণার বিস্তার ঘটায়– তাহলে সরকারের তাদের ধরে শাস্তি দেওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু এই অধিকার নেই যে কোন ধর্মীয় শিক্ষা মানতে বারণ করে বলবে যে, যদি এটি কর তাহলে এর অর্থ হবে তোমরা এ দেশীয় সমাজের মূল ধারার অঙ্গীভূত হচ্ছ না।

আমাদের আহমদীদের সবসময় স্মরণ রাখতে হবে যে, এই যুগ বড় ভয়াবহ যুগ। শয়তান চতুর্দিক থেকে ভয়াবহ হামলা করছে। যদি মুসলমানরা, বিশেষ করে আহমদী মুসলমানরা নারী-পুরুষ-যুবক নির্বিশেষে সকলেই ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা না করেন, তাহলে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই। অন্যদের চেয়ে আমরা আরও বেশি আল্লাহ্ তা'লার শাস্তির শিকার হব; কেননা আমরা সত্য বুঝেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বুঝিয়েছেন, তা সত্ত্বেও আমরা তা মেনে চলি নি। অতএব যদি আমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই, তাহলে প্রতিটি ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস নিয়ে পৃথিবীতে জীবনযাপন করতে হবে। এই কথা মনে করবেন না যে, এসব উন্নত দেশের উন্নতি আমাদের

উন্নতি এবং জীবনের নিশ্চয়তা দিবে, আর এগুলোর অন্ধ অনুকরণের মাঝেই আমাদের জীবন নিহিত। এসব উন্নত দেশের উন্নতি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে, আর এখন এদের চরিত্রের যা অবস্থা বা এদের নৈতিকতা বিবর্জিত কর্মকান্ড– তা তাদেরকে অধঃপাতে নিয়ে যাচ্ছে, আর এর লক্ষণাবলীও প্রকাশ পেয়ে গেছে। এরা খোদার ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং ধ্বংসকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদেরকে তাদের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়ার পরিবর্তে, মানবিক সহমর্মিতার বশবর্তী হয়ে উল্টো তাদেরকে সঠিক রাস্তার দিকে ডেকে এনে রক্ষার চেষ্টা করতে হবে। যদি এদের সংশোধন না হয়, যা কি-না তাদের অহংকার এবং ধর্মের সাথে দূরত্বের কারণে আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, তাহলে পৃথিবীর উন্নতির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সেসব জাতি ভূমিকা পালন করবে যারা চারিত্রিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

অতএব আমি যেভাবে পূর্বেও বলেছি যে, আমাদের, বিশেষ করে যুবক শ্রেণির আল্লাহ্‌র শিক্ষা সম্পর্কে ভাবতে হবে। জাগতিক ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে এর অন্ধ অনুকরণ করার পরিবর্তে আপনার পিছনে জগতবাসীকে চালানোর চেষ্টা করুন। আমি পর্দা এবং পোষাকের প্রসঙ্গে কথা আরম্ভ করেছিলাম। এই প্রেক্ষাপটে এটিও বলতে চাই এবং পরিতাপের সাথে বলতে চাই যে কেউ কেউ বলে, 'ইসলাম এবং আহমদীয়াতের উন্নতির জন্য কি কেবলমাত্র পর্দাই জরুরি বিষয়?' কেউ বলে, 'এই শিক্ষা এখন সেকেলে হয়ে গেছে, আর আমাদের যদি জগতবাসীর মোকাবেলা করতে হয় তাহলে এগুলো আমাদেরকে বাদ দিতে হবে।' নাঊযুবিল্লাহ্! এমন লোকদের সামনে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, যদি দুনিয়ার কীটদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন আর তাদের মত জীবন যাপন করেন, তাহলে এই পৃথিবীর মোকাবেলা করার পরিবর্তে নিজেরা তাতে হারিয়ে যাবেন; আর নামাযেরও কেবল বাহ্যিকতাই অবশিষ্ট থাকবে, বা অন্য কোন নেকীও যদি করেন বা ধর্মীয় শিক্ষা মেনে চলেন তবে তার বাহ্যিক দিকগুলোই কেবল থাকবে; এবং তাও ধীরে ধীরে একসময় মুছে যাবে।

অতএব খোদার কোন নির্দেশকে তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়। এটি সত্যিই ভয়ঙ্কর একটি বিষয়। ইসলামের উন্নতির জন্য প্রত্যেক সেই বিষয় আবশ্যক এবং অবধারিত, যার নির্দেশ খোদা এবং তাঁর রসূল (সা.) দিয়েছেন। পর্দার কঠোরতা শুধু নারীদের জন্যই নয়। ইসলামী বিধি-নিষেধ কেবল নারীদের জন্যই নয়, বরং নর ও নারী উভয়কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা প্রথমে পুরুষদের শালীনতা এবং লজ্জাশীলতা ও পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ- ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ- اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ-(النور:31)

মু'মিনদের বলে দাও যে নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখ আর লজ্জাস্থানের হেফাযত কর, এটি তাদের জন্য বেশি পবিত্রতার কারণহবে। নিশ্চয় তোমরা যা কর তা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত।

আল্লাহ্ তা'লা মু'মিন পুরুষকে প্রথমে সম্বোধন করেছেন যে, দৃষ্টি অবনত রাখ কেননা 'যালিকা আযকা লাহুম'– এটি তাদের পবিত্রতার জন্য আবশ্যক। যদি পবিত্রতা না থাকে তাহলে খোদা লাভ হয় না। তাই মহিলাদের পর্দার কথা বলার পূর্বে পুরুষকে বলেছেন যে, প্রত্যেক এমন বিষয় যার ফলে তোমাদের নেতিবাচক কামনা-বাসনা জাগ্রত হতে পারে তা এড়িয়ে চল। মহিলাদের বাধাহীনভাবে দেখা, তাদের মাঝে উঠাবসা করা, নোংরা চলচ্চিত্র দেখা, না-মাহরামদের সাথে ফেসবুক বা অন্য কোন মাধ্যমে চ্যাট করা– এই বিষয়গুলো পবিত্রতাকে পদদলিত করে। সেকারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বেশ কয়েক স্থানে এ সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে নসীহত করেছেন। তিনি বলেন,

"এটি খোদারই বাণী, যিনি তাঁর পরিষ্কার এবং অতি স্পষ্ট বিবৃতির মাধ্যমে আমাদের প্রতিটি কথা, কর্ম, উঠাবসা, চলাফেরায় নির্দিষ্ট সুবিদিত সীমারেখা প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর মানবিক শিষ্টাচার ও পবিত্র রীতি-নীতি শিখিয়েছেন। তিনি চোখ, কান, জিহ্বা ইত্যাদি অঙ্গের হিফাযতের জন্য পরম তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন যে, قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ- ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ- (সূরা আন নূর: ৩১) অর্থাৎ মু'মিনদের উচিত, তাদের চোখ, কান এবং লজ্জাস্থানকে না-মাহরাম থেকে হিফাযত করা, প্রত্যেক অদর্শনীয় এবং যা শোনা এবং দেখার যোগ্য নয় তা শোনা ও দেখা থেকে বিরত থাকা। আর এ রীতি তাদের অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা বয়ে আনবে; অর্থাৎ তাদের হৃদয় প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত থাকবে। কেননা এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে উস্কে দেয় আর পাশবিক শক্তিবৃত্তিকে পরীক্ষায় নিপতিত করে। এরপর কুরআনে করীম নামাহরাম থেকে নিরাপদ থাকার কত তাকিদপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছে। কত পরিষ্কারভাবে অবহিত করেছে যে, বিশ্বাসীরা তাদের চোখ, কান এবং লজ্জাস্থানকে যেন নিয়ন্ত্রণে রাখে আর অপবিত্রতার স্থান এবং উপলক্ষকে যেন এড়িয়ে চলে।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৯)

এরপর দৃষ্টি অবনত রাখার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, "দৃষ্টি অর্ধ-উন্মীলিত রেখে অদর্শনীয় জায়গা দেখা থেকে আত্মরক্ষা করা আর যা দেখা বৈধ তার প্রতি দৃষ্টিপাত করার রীতিকে আরাবীতে 'গায্যে বাসর' বলা হয়। অর্থাৎ অর্ধ-উন্মীলিত নয়নে যা দেখার অনুমতি আছে তা দেখা এবং যা দেখা নিষিদ্ধ তা এড়িয়ে চলা আর বৈধ বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টিপা ত করাকে আরবীতে 'গায্যে বাসর' বলা হয়। প্রত্যেক পরহেজগার ব্যক্তি যে হৃদয়কে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখতে চায়, তার পশুর মত লাগামহীনভাবে এদিক-সেদিক দেখা বা তাকানো উচিত নয়। বরং তার জন্য আধুনিক তথাকথিত সভ্যতার যুগে দৃষ্টি অবনত রাখা আবশ্যক করা হয়েছে। এটি সেই আশিষময় অভ্যাস যার কল্যাণে তার এই স্বাভাবিক-সহজাত অবস্থা উন্নত নৈতিক গুণে পর্যবসিত হবে আর তার সামাজিক জীবনও প্রভাবিত হবে না। এই নৈতিক চরিত্রকে বলা হয় এহ্সান বা সুরক্ষিত দূর্গে অবস্থান করা।"

(ইসলামি ওসূল কি ফিলাসফী, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪৪)

আরেক জায়গায় বলেন যে, "মু'মিনদেরকে বলে দাও তারা যেন না-মাহরাম এবং প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে এমন বিষয় দেখা থেকে চোখ এতটা বন্ধ রাখে যেন পুরোপুরি চেহারা চোখে না পড়ে আর চেহারার ওপর লাগামহীনভাবে যেন দৃষ্টিপাত না করা হয়। আর এটি যে নিশ্চিত করে যে কখনোই চোখ পুরোপুরি উন্মীলিত করে না দেখে; প্রবৃত্তির তাড়নাযুক্ত দৃষ্টি দিয়ে তো নয়-ই, প্রবৃত্তির তাড়নামুক্ত দৃষ্টিতেও নয়। কেননা, এমনটি করা চূড় ান্ত পর্যায়ের স্খলনের কারণ হয়। বিধি-নিষেধমুক্ত অবস্থায় পবিত্রতা বজায় থাকে না, পরিশেষে মানুষ পরীক্ষার সম্মুখিন হয়। হৃদয় ততক্ষণ পবিত্র হতে পারে না এবং সেই পবিত্র মোকাম ও মর্যাদা, যে পর্যায়ে সত্য সন্ধানীর পদচারণা করা উচিত, তা অর্জিত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টি পবিত্র না হবে। এই আয়াতে এই শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, দেহের সেই সকল ছিদ্রের সুরক্ষা আবশ্যক যে পথে পাপ অনুপ্রবেশ করতে পারে। ছিদ্র শব্দটি যা এই আয়াতে উল্লেখিত রয়েছে, তাতে যৌনাঙ্গ, কান, নাক এবং মুখ সবই অন্তর্ভূক্ত। এখন দেখ, এই যাবতীয় শিক্ষা কত উন্নত মান এবং মহিমাসম্মত যার ওপর অযৌক্তিক কোন জোর দেয়া হয় নি, আর যাতে অতিরঞ্জন বা অপ্রতুলতাও নেই,আর প্রজ্ঞাপূর্ণ ভারসাম্যের ভিত্তিতে প্রতিটি কথা বলা হয়েছে। এই আয়াতের পাঠক তাৎক্ষণিকভাবে অবগত হবে যে, এই যে লাগমাহীনভাবে দেখার অভ্যাস না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে– এর কারণ হল মানুষ যেন কখনোই ফেতনা বা পরীক্ষায় না পড়ে, আর নর-নারী উভয়ের কেউ যেন স্খলিত না হয়।"

(তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৪-১৬৫)

অতএব, এই হল পুরুষদের জন্য ইসলামী শিক্ষা যে, তাদের ওপর সকল অর্থে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে; এরপর মহিলাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এসব সাবধানতা সত্ত্বেও তোমাদেরকে নিজেদের পর্দার বিষয়ে যত্নবান থাকতে হবে। এইসব দেশে যেখানে লজ্জাবোধ সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গেছে , সেখানে আমরা কিভাবে বলতে পারি যে, পর্দার প্রয়োজন নেই। পর্দাহীনতা এবং বন্ধুত্ব অনেক নোংরামিতে পর্যবসিত হচ্ছে। আমাদের এগুলো থেকে আত্মরক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। এর ফলে এটিও স্পষ্ট হয়ে গেল, যদি মহিলাদের পুরুষের সাথে সাঁতার কাটার অনুমতি না থাকে তাহলে পুরুষদেরও মহিলাদের সাথে সাঁতার কাটার অনুমতি নাই।

সুতরাং এই সব বিধি-নিষেধ কেবল নারীদের জন্য নয়, বরং পুরুষদের জন্যও বটে। মহিলাদের দেখে পুরুষদেরকে দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দিয়ে নারীর সম্মানের সুরক্ষা করা হয়েছে। অতএব, ইসলামের প্রতিটি নির্দেশ প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ এবং পাপের আশঙ্কা থেকে মানুষকে মুক্ত করে।জার্মানিতে গত জলসা সালানার সময় মহিলাদের তাঁবুতে নর-নারীর পর্দার পার্থক্য,

তাদের দায়িত্ব এবং তাদের কর্তব্য আর নারীর অধিকার সম্পর্কে যে আলোচনা করেছিলাম, তারপর এক জার্মান মহিলা বলেন, তিনি এসেছিলেন এবং আমার পুরো বক্তৃতা শুনে বলেছেন যে, 'পূর্বে আমি মনে করতাম যে ইসলাম মহিলাদের অধিকার পদদলিত করে। কিন্তু আজকে আপনার কথা শুনে আমি জানতে পেরেছি যে, ইসলাম নারীর অধিকার আর তার সম্মান অধিক সুক্ষ্মতার সাথে বর্ণনা করে আর প্রতিষ্ঠা করে।' অতএব কোন আহমদী মেয়ে বা মহিলার বা কোন ছেলের কোন প্রকার হীনম্মন্যতার শিকার হওয়ার প্রয়োজন নেই। ইসলামী শিক্ষাই পৃথিবীকে শান্তিধামে পরিণত করবে এবং খোদার দিকে আসার বিষয়টা নিশ্চিত করবে। জগৎ একদিন বুঝতে পারবে, ইসলামী শিক্ষা নিয়ে ভাবা এবং তা মানা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। পুরুষদেরকে এই নির্দেশ যে 'দৃষ্টি অবনত রাখ, নারীর সম্মান প্রতিষ্ঠা কর'- এটি দেয়ার পর মহিলাদেরকে বিষদভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমাদেরকেও দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে। আর এটি বলেছেন যে কিভাবে এবং কাদের সামনে পর্দা করতে হবে। যদি এই কথাগুলো মেনে চল, তবে তোমরা সফল হবে। শেষের দিকে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, পর্দা এবং লজ্জাবোধ তোমাদের সাফল্যের প্রতীক, তোমাদের ইহকাল এবং পরকালের সাফল্য সুনিশ্চিত হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন

وَقُل لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۭ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (النور:32)

অর্থাৎ 'আর তুমি মু'মিন নারীদেরকে বল, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে, নিজেদের লজ্জাস্থানের সুরক্ষা করে এবং নিজেদের সাজগোজ ও সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, কেবল তা ছাড়া যা আপনা আপনিই প্রকাশ পায়, এবং তারা যেন তাদের মাথার কাপড় নিজেদের বুকের ওপর টেনে নেয়, তারা যেন তাদের স্বামী অথবা তাদের পিতা অথবা তাদের স্বামীর পিতা অথবা তাদের পুত্র অথবা তাদের স্বামীর পুত্র অথবা তাদের ভাই অথবা তাদের ভাইয়ের ছেলে অথবা তাদের বোনের পুত্র অথবা তাদের নারী অথবা তাদের অধিকারভুক্তদের অথবা এরূপ পুরুষ পরিচারক যারা দুষ্কর্মপ্রবণ নয় অথবা অল্পবয়স্ক শিশুরা যারা এখনো নারীদের লজ্জাস্থান সম্পর্কে কোন ধারণা লাভ করে নি- এরা ছাড়া অন্য কারো সামনে নিজেদের সাজগোজ ও সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন এমন ভঙ্গীতে না হাঁটে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। আর হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দিকে বিনত হও যেন তোমরা সফল হতে পার। (সূরা আন নূর: ৩২)

দৃষ্টি সংযত রাখা বা দৃষ্টি অবনত রাখা এবং পর্দার মাধ্যমেই মানুষের সম্ভ্রমের এবং সম্মানের সুরক্ষা হবে; পুরুষদেরও দৃষ্টি, নারীদেরও দৃষ্টি। উন্নত বিশ্বে বা উন্নত দেশগুলোতে সম্মান এবং সম্ভ্রমের হিফাযতের মানদণ্ডই বদলে গেছে। যদি না-মাহরামদের সম্পর্ক ছেলে এবং মেয়ের পারস্পরিক ইচ্ছার অধিনে হয় তাহলে সেটি ব্যভিচার নয়, আর যদি ইচ্ছার পরিপন্থি হয় তাহলে সেটিকে ব্যভিচার আখ্যায়ীত করা হয়। যদি অধঃপতন এমন পর্যায়ে পৌঁছে, তবে এমন ক্ষেত্রে এক মু'মিনের খোদার আশ্রয়ের সন্ধানের জন্য অনেক বেশি দোয়া করা উচিত।

ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তিকারীরা বলে যে, 'নারীকে পর্দা পরিয়ে-পর্দার ওপর জোর দিয়ে তার অধিকার পদদলিত করা হয়েছে'; আর এর ফলে অপরিপক্ক মন-মানসিকতার মেয়েরা প্রভাবিত হয়। ইসলাম পর্দা বলতে বন্দীদশাকে বুঝায় না, গৃহের চতুর্সীমায় মহিলাকে আবদ্ধ করা এর অর্থ বা উদ্দেশ্য নয়। হ্যাঁ, লজ্জাবোধ নিশ্চিত করা হল এর উদ্দেশ্য।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন যে, "আজকাল পর্দার ওপর হামলা করা হয়। কিন্তু এরা জানে না যে ইসলামী পর্দার অর্থ কারাগার নয়, বরং এটি একপ্রকার বাধা যেন তারা পরস্পরকে দেখার সুযোগ না পায়। পর্দা যদি থাকে তাহলে স্খলন থেকে রক্ষা পাবে। এক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি অবশ্যই বলবে যে, যেখানে নর-নারী নির্বিচারে লাগামহীনভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পায়, ভ্রমণের সুযোগ পায়, তারা যে প্রবৃত্তির কামনা -বাসনার শিকার হয়ে হোঁচট খাবে না- তা কিভাবে নিশ্চিত হয়ে বলা যায়? প্রায় সময় শোনা এবং দেখা যায় যে, এমন জাতির লোকেরা অপরিচিত পুরুষ এবং মহিলার একই ঘরে নিভৃতে দরজা বন্ধ অবস্থায় থাকাকেও অশোভনীয় মনে করে না, যেন এটিই সভ্যতা। এই অশোভনীয় বিষয়গুলো এড়ানোর জন্য ইসলামীশরীয়তের প্রবর্তক [মহানবী (সা.)] সেই সব বিষয়ের অনুমতিই দেন নি যা কারো জন্য হোঁচট খাওয়ার কারণ হতে পারে। এমন অবস্থার জন্য বলে দিয়েছেন যে, যেখানে এভাবে না-মাহরাম নর-নারী একত্রিত হয়, সেখানে শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে থাকে। এইসব অপবিত্র পরিণতি নিয়ে একটু চিন্তা কর যা এমন লাগামহীন শিক্ষার কারণে ইউরোপ ভুগছে। এই যে অনেক জায়গায় পতিতাদের ন্যায় চরম লজ্জাস্কর জীবন অতিবাহিত করা হচ্ছে, তা এসব শিক্ষারই ফলাফল। যদি কোন কিছুকে ক্ষতি থেকে বাঁচাতে চাও তাহলে তার হেফাযত কর বা সুরক্ষা কর। যদি হেফাযত না কর আর এটি মনে কর যে এরা ভাল মানুষ, তাহলে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ- সেই জিনিস অবশ্যই ধ্বংস হবে। ইসলামী শিক্ষা কত পবিত্র শিক্ষা যা নর-নারীকে পৃথক পৃথক রেখে স্খলন থেকে রক্ষা করেছে আর মানুষের জীবনকে অসহনীয় ও তিক্ত করে তুলে নি, যার কারণে ইউরোপ ক্রমাগত গৃহযুদ্ধ এবং আত্মহত্যা দেখেছে। অপরিচিত মহিলাকে দেখার ঢালাও অনুমতি দেওয়ার পরিণাম হল কোন কোন ভদ্র মহিলার জীবনও পতিতাবৃত্তির মাঝে পর্যবসিত হওয়া।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪-৩৫)

এরপর পর্দার রীতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে কিভাবে পর্দা করা উচিত। তিনি বলেন, "বিশ্বাসী নারীদের বল, তারা যেন নিজেদের চোখ না-মাহরামদের দেখা থেকে বিরত রাখে আর কানও না-মাহরামদের থেকে রক্ষা করে অর্থাৎ তাদের যৌন আলাপচারিতা যেন না শোনে। আর নিজেদের লজ্জাস্থানকে যেন ঢেকে রাখে। নিজেদের সৌন্দর্যপূর্ণ অঙ্গগুলো না-মাহরামের সামনে যেন উন্মুক্ত না করে। ওড়নাগুলো যেন এমনভাবে টেনে রাখে যে তা মাথা হয়ে বক্ষে নেমে আসে অর্থাৎ বুক, উভয় কান, মাথা আর মুখমন্ডল যেন চাদরের পর্দায় আবৃত থাকে, আর নৃত্যশিল্পীদের মত পা দিয়ে যেন মাটিতে আঘাত না করে। এটি সেই রীতি যা মেনে চলা স্খলন থেকে রক্ষা করতে পারে।"

(ইসলামী ওসূল কি ফিলাসফী, রূহানী খাযায়েন, ১০ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪১-৩৪২)

এখানে এ কথাও আমি স্পষ্ট করতে চাই, কোন কোন মহিলা এ প্রশ্নের অবতারণা করে যে, আমরা মেকআপ করে থাকি; চেহারা যদি নেকাব দ্বারা ঢেকে নেওয়া হয় তাহলে মেকআপ নষ্ট হয়ে যায়, আমরা কিভাবে পর্দা করব?' প্রথম কথা হল, যদি মেকআপ না করা হয় তাহলে ন্যুনতম পর্দা যা করা উচিত আর মসীহ মওউদ (আ.) তার যা মান বর্ণনা করেছেন তা হল- চোখ-মুখ খোলা রাখা যায়, তবে চেহারার বাকী অংশ ঢাকতে হবে। আর যদি মেকআপ করতে হয় তাহলে মুখও ঢাকতে হবে। এদের এটি ভাবা উচিত যে, খোদার শিক্ষা অনুসরণ করে সৌন্দর্য গোপন করবেন, না-কি পৃথিবীর মানুষকে নিজের সৌন্দর্য এবং মেকআপ দেখাবেন। সৌন্দর্য কাদের সামনে প্রকাশ করা যায় এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। নিকটাত্মীয়, ভাই-বোন, স্বামী, পিতা, তাদের সন্তান-সন্ততির কথা বলা হয়েছে যে, তাদের সাথে পর্দার প্রয়োজন নেই। মেকআপ ইত্যাদি সাজ-সজ্জা তাদের সামনে প্রকাশ করা যেতে পারে, এর বাহিরে নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা প্রকাশ করেছেন আর সেই সব আত্মীয় -স্বজনের কথাও আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন। আর তাও সেসব সৌন্দর্য যা প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক, যেমন চেহারা, উচ্চতা ইত্যাদি- এই ধরণের সৌন্দর্য। এর অর্থ এটি নয় যে, তাদের সামনেও ঘরে টাইট জিন্স বা ব্লাউজ পরে ঘোরাঘুরি করবে বা এমন পোশাক পরবে যার ফলে অন্য কোন কিছু প্রকাশ পায়। এমন আত্মীয়-স্বজনের সামনেও এ ধরণের পর্দা করা আবশ্যক।

অনুরূপভাবে আরেকটি কথা মুরব্বীদের এবং তাদের স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে, তারাও যেন নিজেদের পোশাক এবং দৃষ্টি সংযত রাখার ক্ষেত্রে সাবধান থাকে। জামাত তাদের আদর্শ দেখে থাকে। মুরব্বী এবং মুবাল্লেগদের স্ত্রীরাও মুরব্বীই হয়ে থাকেন। তাদের সব বিষয়ে উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা করুন যেন আমাদের পুরুষরাও এবং আমাদের নারীরাও লজ্জাশীলতার উন্নত মান প্রতিষ্ঠাকারী হন, আর আমরা সবাই যেন সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী শিক্ষামালা মেনে চলি।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

জুমআর খুতবা

মুসলমানদের জন্য নামায যে আবশ্যক সে কথা আমরা কে না জানি? কুরআন শরীফে বিভিন্ন জায়গায়,বিভিন্ন বরাতে নামাযের গুরুত্ব তুলে ধরে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মহানবী (সা.)ও বলেছেন, নামায ইবাদতের নির্যাস; বরং তিনি (সা.) একথা পর্যন্ত বলেছেন যে, নামায পরিত্যাগ করা মানুষকে কুফরি (অবিশ্বাস) এবং শিরকের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। নামাযের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম বান্দাকে যে বিষয়ে জিজ্ঞসাবাদ করা হবে তা হল নামায। যদি এই হিসাব ঠিক থাকে, তাহলে সে সফলকাম হবে বা পরিত্রাণ পাবে, নতুবা সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। মহানবী (সা.) শিশুদেরকেও নামাযে অভ্যস্ত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ৭ বছর বয়সে উপনীত হতেই শিশুদের নামায পড়ার নির্দেশ দাও; ১০ বছর বয়সে তাকে রীতিমত নামাযে অভ্যস্ত করানোর জন্য যদি কিছুটা কঠোরতাও করতে হয় তবে তা কর। এখন পিতা-মাতা নিজেরাই যদি নিয়মিত নামাযে অভ্যস্ত না হয়,তবে সন্তানদের কীভাবে বলতে পারে? কিংবা সন্তানরা যদি তাদের অনুষ্ঠানাদিতে বা অন্য কোন মাধ্যমে এ হাদীস বা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ শুনে, কিন্তু ঘরে যদি পিতাদের নামাযের উপর প্রতিষ্ঠিত না পায়, তাহলে তাদের উপর কী প্রভাব পড়বে?

এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার ও নিবেদিতপ্রাণ দাসকে প্রেরণ করেছেন, যিনি আমাদেরকে ইবাদত এবং নামাযের সত্যিকার জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি অর্জনের পথ দেখিয়েছেন।

নামায নিঃসন্দেহে সব আহমদীর জন্য আবশ্যক বা ফরয। কিন্তু একই সাথে মহানবী (সা.) বাজামা'ত নামাযের যে গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন,সে অনুযায়ী প্রত্যেক বুদ্ধিসম্পন্ন সাবালক পুরুষ ব্যক্তির জন্য বাজামা'ত নামায পড়া ফরয বা আবশ্যক। কিন্তু আমরা যা দেখি তা হল, এদিকে পুরো মনোযোগ নেই এবং এক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়েছে । নিঃসন্দেহে একজন সত্যিকার মু'মিনের জন্য নামায ফরয, আর এ বিষয়ে তাকে নিজেই সচেতন থাকতে হবে; কিন্তু একই সাথে জামাতে একটি ব্যবস্থাপনাও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সেই ব্যবস্থাপনারও এদিকে মনোযোগ আর্কষণ করার ধারা অব্যহত রাখা উচিত, সর্বদা এর প্রকৃত তাৎপর্য স্পষ্ট করা উচিত।

সত্যিকার অর্থে আহমদী হিসেবে আমরা নিজেদের দায়িত্ব তখন পালন করতে সক্ষম হব, যখন আমরা নামাযের হিফাযত করব, আর এথেকে আধ্যাত্মিকতার স্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করব।

নিজের উদ্দেশ্য যখন চরিতার্থ হয়ে যায়; যখন সমস্যা থেকে উত্তরণ হয়, তখন অনেকেই এমন আছে যাদের নামাযে মধ্যে বিনয়াবনত দোয়ার ক্ষেত্রে আলস্য চলে আসে।

সমাজের সার্বিক অবস্থাও একজন মু'মিনের হৃদয়ে বেদনা সৃষ্টি করা উচিত। এই বেদনাঘন পরিস্থিতির যখন উদ্ভব হয়, তখন বেদনার সাথে দোয়াও উদ্ভূত হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাকিস্তানে জামাতের অবস্থা ভয়াবহ। চতুর্দি ক থেকে জামাতের সদস্যদের বিরুদ্ধে ঘৃণার তীর নিক্ষেপ করা হচ্ছে। হিংসা এবং বিদ্বেষের বহির্প্রকাশ ঘটছে। মোল্লাদের ভয়ে বা তাদের কথায় যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে তার ফলশ্রুতিতে জামাতের সাথে যেসব অ-আহমদীর পুরনো সম্পর্ক রয়েছে, তাদের মাঝেও অনেক ক্ষেত্রে বিরোধিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোটের উপর যুলুম এবং অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে সব আহমদীর একদিকে যেমন উপভোগ্য ও আনন্দযুক্ত নামায পড়ার চেষ্টা করা উচিত, একইসাথে মসজিদ আবাদ করার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত।

এমন খুতবা শুনে কী লাভ যার ফলে আল্লাহর প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয় না, আর সেই মৌলিক দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় না যা পালন করা একান্ত আবশ্যক?

তো আমি যেভাবে বলেছি, আমি দুই-তিন খুতবা পর পর বাজামা'ত নামায বা ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা করে থাকি। যদি এর কোন প্রভাব-ই না পড়ে, তাহলে শুধু সংখ্যার ঘর পূরণ করে লাভ কী?

পাকিস্তানে আহমদীদের যে অবস্থার কথা আমি তুলে ধরলাম, সে অবস্থার পরও যদি আল্লাহ তা'লার প্রতি তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ না হয়, তাহলে কবে হবে? কোন কোন জামা'তে নামাযের উপস্থিতি ভালো, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন না কোন ব্যক্তির কোন না কোন নামায ছুটে যাচ্ছে। কেউ কেউ এমন আছে যারা কোন কোন সময় দু'এক বেলার নামায পড়ে না, বা তাদের নামায ছুটে যায়। এর একটি কারণ, আমি যেভাবে বলেছি, এদিকে ব্যবস্থাপনা মনোযোগ বা দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। ব্যবস্থাপনাও অন্যান্য বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেয়।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সত্তায় ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়ার পর নামায কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব প্রত্যেক আহমদী নর -নারীর নিজেদের নামাযের হেফাজত করারআর বিশেষ করে পুরুষদের জামাতের সাথে নামায পড়ার প্রতি গভীর দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে **প্রদত্ত** ২০শে জানুয়ারী, **২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (২০ সুলাহ, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)**

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মুসলমানদের জন্য নামায যে আবশ্যক সে কথা আমরা কে না জানি? কুরআন শরীফে বিভিন্ন জায়গায়,বিভিন্ন বরাতে নামাযের গুরুত্ব তুলে ধরে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মহানবী (সা.)ও বলেছেন, নামায ইবাদতের সার বা নির্যাস; (সুনান তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত) বরং তিনি (সা.) একথা পর্যন্ত বলেছেন যে, নামায পরিত্যাগ করা মানুষকে কুফরি (বা অবিশ্বাস) এবং শিরকের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান) নামাযের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম বান্দাকে যে বিষয়ের হিসাব-নিকাশ করা হবে তা হল নামায। যদি এই হিসাব ঠিক থাকে, তাহলে সে সফলকাম হবে বা পরিত্রাণ পাবে, নতুবা সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (তিরমিযি,কিতাবুস সালাত)

মহানবী (সা.) শিশুদেরকেও নামাযে অভ্যস্ত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ৭ বছর বয়সে উপনীত হতেই শিশুদের নামায পড়ার নির্দেশ দাও; ১০ বছর বয়সে তাকে রীতিমত নামাযে অভ্যস্ত করানোর জন্য যদি কিছুটা কঠোরতাও করতে হয় তবে তা কর। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত)

এখন পিতা-মাতা নিজেরাই যদি নিয়মিত নামাযে অভ্যস্ত না হয়,তবে সন্তানদের কীভাবে বলতে পারে? কিংবা সন্তানরা যদি তাদের অনুষ্ঠানাদিতে বা অন্য কোন মাধ্যমে এ হাদীস বা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ শুনে, কিন্তু ঘরে যদি পিতাদের নামাযের উপর প্রতিষ্ঠিত না পায়, তাহলে তাদের উপর কী প্রভাব পড়বে? অবশ্যই এমন পিতাদের সন্তানরা এটি মনে করবে

যে, এই নির্দেশের কোন গুরুত্বই নেই। বরং একটি নির্দেশের গুরুত্ব উপেক্ষা করার কারণে শিশুর মন থেকে প্রতিটি ইসলামী নির্দেশের আবশ্যকতার প্রভাব হারিয়ে যাবে। এমন মানুষ মহানবী (সা.)-এর উক্তি অনুসারে কেবল নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূ ক্ত হয় না, বরং নিজেদের সন্তান-সন্ততিকেও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করার কারণ হয়ে থাকে। জাগতিক আশা-আকাংখা পূর্ণ করার জন্য,সন্তানদের জাগতিক উন্নতির জন্য তো পিতা-মাতা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে থাকেন, কিন্তু যে বিষয়ে সত্যিকার অর্থে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত, তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা থাকে না।

এছাড়া একজন মু'মিনের জন্য শুধু নামাযই আবশ্যক নয়, যার মাধ্যমে তার আধ্যাত্মিক ময়লা-আবর্জনা দূরীভূত হয়, যেভাবে এক উপমা বর্ণনা করতে গিয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমরা কি মনে কর যে, কারো বাড়ির সামনে দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয় আর সে দৈনিক পাঁচ বেলা তাতে গোসল করা সত্ত্বেও তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকতে পারে? সাহাবীরা (রা.) নিবেদন করলেন, অবশ্যই কোন ময়লা থাকতে পারে না। মহানবী (সা.) তখন বললেন, পাঁচ বেলার নামাযের দৃষ্টান্তও এমনই। আল্লাহ্ তা'লা নামাযের কল্যাণে পাপ ক্ষমা করেন, দুর্বলতা দূর করেন। (বুখারী কিতাবুল মোওয়াকিতুস সালাত) যে পাঁচ বেলা নামায পড়ে, তার আত্মায় কোন কলুষ অবশিষ্ট থাকে না।

অতএব, এই হল নামাযের গুরুত্ব, যা মহানবী (সা.) এক অনুপম দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, নামায কেবল পড়ারই নির্দেশ দেন নি, বরং সত্যিকার মু'মিন পুরুষদের আত্মার কলুষ দূরীভূত করার জন্য বিষয়টি আরো খোলাসা করে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ঘর থেকে ওজু করে আল্লাহ তা'লার ঘর অর্থাৎ মসজিদে ফরয বা আবশ্যকীয় নামায আদায়ের জন্য অগ্রসর হয়, তাহলে যাওয়ার পথে সে যতগুলো পদক্ষেপ নিবে সেসব পদক্ষেপের একটিতে তার একটি পাপ দূরীভূত হবে ও পরবর্তী পদক্ষেপে তার পদমর্যাদা একগুণ উন্নীত হবে। অর্থাৎ প্রতিটি পদক্ষেপ তার জন্য পুণ্য বয়ে আনবে। (মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ ও মোওয়াযিউস সালাত)

একবার বাজামা'ত নামাযের গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে তিনি (সা.) বলেন, 'আমি কি তোমাদের সেই কথা জানাব না, যার কল্যাণে আল্লাহ তা'লা পাপ মোচন করেন এবং পদমর্যাদা উন্নীত করেন?' সাহাবাগণ (রা.), যারা প্রতিটি মুহূর্ত এই সুযোগের সন্ধানে থাকতেন যে কিভাবে আল্লাহ তা'লাকে সন্তুষ্ট করার যায় বা তাঁকে সন্তুষ্ট করার রীতি শেখা যায়, তাঁর নৈকট্য অর্জন করা যায়, পাপের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করা যায়, তারা (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহররসূল! অবশ্যই আমাদেরকে জানান।' তিনি (সা.) বলেন, 'অনিচ্ছা সত্ত্বেও খুব ভালোভাবে ওজু করা, আর দূর থেকে হেঁটে মসজিদে আসা, আর এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের প্রতীক্ষায় থাকা। এ সব কিছু পাপের সাথে মানুষের দূরত্ব বৃদ্ধি করে।' তিনি (সা.) বলেন, 'শুধু তা-ই নয়, এটি এক ধরনের 'রিবাত'-ও বটে।' (মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত) অর্থাৎ, এটি সীমান্তে সেনাঘাঁটি স্থাপনের শামিল। যেভাবে রাষ্ট্র নিজ নিরাপত্তার জন্য সীমান্তে সেনা ছাউনি গড়ে বা সেনা ঘাঁটি স্থাপন করে, এটিও সেরকম একটি বিষয়।

সীমান্তে ঘাঁটি কেন স্থাপন করা হয়? এজন্য যে, যেমনটি আমি বলেছি, দেশের নিরাপত্তার জন্য, যেন শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকা যায় আর আক্রমণ হলে যেন তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবেলার প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং মু'মিনের সবচেয়ে বড় হুমকি বা আশঙ্কা, যা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য তার ঘাঁটি স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে, তা হল শয়তানের আশঙ্কা; জাগতিক কামনা-বাসনার আশঙ্কা যা শয়তান হৃদয়ে সৃষ্টি করে,যার মাধ্যমে শয়তান হামলা করে। অতএব, এসব থেকে নিরাপদ থাকার জন্য ছাউনি হল বাজামা'ত নামায; এটিই সীমান্তরক্ষীদের সেই ব্যাটেলিয়ন যা শয়তানের হামলা থেকে নিরাপদ রাখবে; পাপ থেকে মানুষ নিরাপদ থাকবে আর পুণ্যের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে।

অনুরূপভাবে মহানবী (সা.) একথাও বলেছেন যে, বাজামা'ত নামায পড়লে একা নামায পড়ার তুলনায় ২৭গুণ বেশি পুণ্য লাভ হয়। (বুখারী কিতাবুস সালাত)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাজামা'ত নামাযের গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন, "জামা'তের সাথে নামায পড়ার জন্য যে অধিক সওয়াব নির্ধারন করেছেন তার কারণ হল, এর মাধ্যমে ঐক্য সৃষ্টি হয়। আর ঐক্যকে ব্যবহারিক রূপ দেয়ার জন্য এই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং তাকিদ করা হয়েছে যে, পরস্পরের পা-ও যেন সমান হয়; অর্থাৎ যখন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াও, তখন পা যেন বরাবর থাকে,পায়ের গোড়ালী সমান রাখা হয় এবং কাতার বা সারি যেন সোজা হয় আর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো হয়। এর উদ্দেশ্য হল, সবাই মিলে যেন একটি একক মানুষে পরিণত হয়; সারিবদ্ধ হলে যেন এক ব্যক্তির মত হয়ে যায়, অর্থাৎ তাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হয়, একজনের জ্যোতি দ্বিতীয় ব্যক্তির মাঝে সঞ্চালিত হতে পারে; সেই বৈষম্য, যার ফলে অহমিকা ও স্বার্থপরতা দানা বাঁধতে পারে, তা যেন না থাকে; অর্থাৎ ধনী-গরীব সবাই একই সারিতে দাঁড়াবে। কিছু লোকের মাথায় অহংকার-স্বার্থপরতা ইত্যাদি কিছু বিষয় থেকে থাকে; বাজামা'ত নামায এগুলোকে দূরীভূত করে। তিনি (আ.) বলেন, ভালোভাবে স্মরণ রেখো যে, মানুষের মাঝে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে সে অপরের জ্যোতিঃ গ্রহণ করতে পারে।" (মালফুযাত ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪৭-২৪৮) (যে পুণ্যের ক্ষেত্রে উন্নত মার্গে রয়েছে, তার পুণ্য অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে বা দ্বিতীয় ব্যক্তি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তা গ্রহণ করে।)

অতএব, পুণ্যের প্রভাব গ্রহণ এবং বিস্তারের জন্য বাজামা'ত নামায কল্যাণকর হয়ে থাকে। বাজামা'ত নামায একদিকে যেমন একতার বহিঃপ্রকাশ, যা খোদা তা'লা উম্মতের মাঝে সৃষ্টি করতে চান; তেমনিভাবে এটি পরস্পরের নেকী এবং পুণ্যকে প্রভাবিত করে। অধিক সৎকর্মশীল এবংআধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ব্যক্তি এবং এদিক থেকে দুর্বল মানুষ যখন একই সারিতে দন্ডায়মান হয়, তখনদুর্বলদের উপর পুণ্যবানদের পুণ্যের ইতিবাচক প্রভাব পড়ে, তাদের মাঝেও পুণ্যের ক্ষেত্রে উন্নতি, অগ্রগতি এবং আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির শক্তি বৃদ্ধি পাবে। যখন এই ঐক্য সৃষ্টি হয় আর আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পায়, তখন শয়তানী অপশক্তি দুর্বল হয়ে যায়।

এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার ও নিবেদিতপ্রাণ দাসকে প্রেরণ করেছেন, যিনি আমাদেরকে ইবাদত এবং নামাযের সত্যিকার জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি অর্জনের পথ দেখিয়েছেন। অতএব, একদিকে যদি আমরা এ দাবি করি যে, আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির জন্য এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য রসূলে করীম (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাস হযরত মসীহ্ মওউদ এবং মাহ্দী (আ.)-কে গ্রহণ করেছি; অন্যদিকে আমাদের ব্যবহারিক আচরণে, বিশেষ করে মৌলিক ইসলামী নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে যদি দুর্বলতা থাকে, মৌলিক অবশ্যকরণীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যদি দুর্বলতা থাকে, আর সেই ক্ষেত্রে যদি দুর্বলতা থেকে যায়, যা প্রতিষ্ঠা করা হল আমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য; সেই ক্ষেত্রে যদি দুর্বলতা থাকে যা আল্লাহ তা'লা এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য নূন্যতম মানদন্ড হিসেবে নির্ধারণ করেছেন; তাহলে আমরা কীভাবে এ দাবি করতে পারি যে, আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এবং আল্লাহ তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে মসীহ্ মওউদ (আ.)কে গ্রহণ করেছি?

অতএব, যেমনটি আমি বলেছি, কুরআনেও বহু জায়গায় পাঁচ বেলার নামাযের আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.)-এর বাণীও অত্যন্ত স্পষ্ট, যা আমি তুলে ধরেছি। নামায নিঃসন্দেহে সব আহমদীর জন্য আবশ্যক বা ফরয। কিন্তু একই সাথে মহানবী (সা.) বাজামা'ত নামাযের যে গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন,সে অনুযায়ী প্রত্যেক বুদ্ধিসম্পন্ন সাবালক পুরুষ ব্যক্তির জন্য বাজামা'ত নামায পড়া ফরয বা আবশ্যক। কিন্তু আমরা যা দেখি তা হল, এদিকে পুরো মনোযোগ নেই এবং এক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়েছে । নিঃসন্দেহে একজন সত্যিকার মু'মিনের জন্য নামায ফরয, আর এ বিষয়ে তাকে নিজেই সচেতন থাকতে হবে; কিন্তু একই সাথে জামাতে একটি ব্যবস্থাপনাও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সেই ব্যবস্থাপনারও এদিকে মনোযোগ আর্কষণ করার ধারা অব্যহত রাখা উচিত, সর্বদা এর প্রকৃত তাৎপর্য স্পষ্ট করা উচিত। আমি প্রায়শঃ আমার খুতবায় এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি, কোন না কোন প্রেক্ষিতে নামাযের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু এটিকে প্রতিধ্বনিত করার দায়িত্ব হল মুরব্বীদের এবংজামাতের ব্যবস্থাপনার; তাদের দায়িত্ব এ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা। জামা'তের প্রতিটি সভ্য এবং সদস্যের কাছে নামাযের গুরুত্বের কথা বারবার পৌঁছান, প্রতিধ্বনিত করুন। সত্যিকার অর্থে আহমদী হিসেবে আমরা নিজেদের দায়িত্ব তখন পালন করতে সক্ষম হব, যখন আমরা নামাযের হিফাযত করব, আর এথেকে আধ্যাত্মিকতার স্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করব। আর এই আধ্যাত্মিক স্বাদ এবং আনন্দ লাভ হওয়া আরম্ভ হলেই নামায আদায়ের প্রতি নিজ থেকেই মনোযোগ নিবদ্ধ হবে।

অতএব আমি যেভাবে বলেছি, এদিকে প্রত্যেক আহমদীর নিজেরই মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে যে কিভাবে আমাদের নামায পড়া উচিত; এমন নামায পড়া উচিত যা আমাদের আন্তরিক প্রশান্তির কারণ হতে পারে, যা উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নামাযের স্বাদ কিভাবে পাওয়া সম্ভবপর হতে পারে সেদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন, "আমি দেখি, (একটি উদাহরণ দিয়েছেন তিনি) যে, এক মদ্যপায়ী ও নেশাসক্তমানুষ উপর্যুপরি পান করতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত নেশা না হয়। নেশাগ্রস্ত হওয়ার লক্ষ্যে সে উপর্যুপরি মদ পান করতে থাকে। এক পর্যায়ে গিয়ে তার এক প্রকার নেশা হয়ে যায়। বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি এটি থেকে লাভবান হতে পারে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে সে এই উদাহরণ থেকে শিখতে পারে। কিভাবে? আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির জন্য, নামযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রীতিমত তার নামায পড়া উচিত, যথাসময়ে নামায পড়া উচিত, আর কখনো নামায পরিত্যাগ করা উচিত নয়। আর যতক্ষণ সে স্বাদ না পায় ততক্ষণ তার পড়তে থাকা উচিত। যেভাবে মদ্যপায়ী ব্যক্তির মাথায় এক অলীক স্বাদ লুক্কায়িত থাকে, যা অর্জন করা তারআসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে; মদ্যপায়ী যখন মদ পান করে, তখন তার মাথায় এক লক্ষ্য নির্ধারিত থাকে যে, আমাকে এই স্বাদ পেতেই হবে; তিনি (আ.) বলেন, 'যেভাবে মদ্যপায়ী তার নেশার জন্য এক লক্ষ্য নির্ধারণ করে,তেমনিভাবে এক মুমিনেরও উচিত কোন লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত, যা নামাযের ক্ষেত্রে তাকে অর্জন করতে হবে। যদি এভাবে বারংবার অধ্যবসায়ের সাথে সে চেষ্টা করে, তবেই কেবল সেই স্বাদ পেতে পারে। তিনি (আ.) বলেন,

অনুরূপভাবে তার মন-মস্তিষ্ক আর তার সকল শক্তি-বৃত্তি নামাযে সেই স্বাদ পাওয়ার জন্য নিয়োজিত করতে হবে।এক নামাযী যখন নামায পড়ে, তখন যেন মাথায় এই লক্ষ্য রাখে আর তার পুরো মনোযোগ ও যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য যেন এই লক্ষ্যে নিয়োজিত করে যে– আমাকে এই স্বাদ পেতেই হবে। আর এর জন্য সংকল্প বা ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। সংকল্প যদি দৃঢ় হয় তবেই সে অবিচল হতে পারবে। তিনি (আ.) বলেন, এরপর এক নিষ্ঠা এবং আবেগ-উচ্ছ্বাস নিয়ে, অন্ততপক্ষে নেশাখোর ব্যক্তির উৎকণ্ঠা এবং ব্যকুলতার সদৃশ এক দোয়া যখন তার মধ্য থেকেউদ্ভূত হবে যেন সে নামাযে সেই স্বাদ পায়, তাহলে আমি বলছি আর সত্য সত্যই বলছি যে, সেই স্বাদ সে লাভ করবে। যদি এক বেদনা থাকে, এক উৎকণ্ঠা থাকে, ব্যকুলতা থাকে যে, 'হায়! আমি যদি নামাযে আনন্দ লাভ করতাম'; নামায পড়তে গিয়ে যদি আল্লাহ তা'লার দরবারে বারবার এই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়; তাহলে নিশ্চিতভাবে সে সেই আনন্দ লাভ করবে, সেই স্বাদ লাভ করবে।'

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭-৮)

অতএব নামাযের স্বাদ পাওয়ার স্থায়ী প্রচেষ্টা অবশেষে হৃদয় বিগলিত করে তাকে সেই স্বাদ বা সেই আনন্দ উপহার দেয়। তিনি (আ.) এই বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, 'আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নামায অশ্লীলতা এবং পাপ থেকে রক্ষা করে। কিন্তু তাসত্ত্বেও আমরা দেখি আর অনেকে প্রশ্নও করে যে, নামায পড়া সত্ত্বেও তো মানুষ পাপ করছে, পাপে লিপ্ত হচ্ছে।' তিনি (আ.) বলেন, 'এর উত্তর হল, তারা আন্তরিক প্রেরণা এবং সততা ও নিষ্ঠার সাথে নামায পড়ে না, বরং প্রথাগতভাবে ও অভ্যাসগতভাবে ঠোকর মারে। (মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭-৮)

আমাদের সবসময় স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, নামায পাপ থেকে মুক্ত রাখে– এটি সত্য; আল্লাহ্‌র কথা মিথ্যা হতে পারে না। যাদের মাঝে নামায পড়া সত্ত্বেও পাপ থেকে যায়, তাদের নামায কেবল বাহ্যিক নামায হয়ে থাকে। তারা নামাযের প্রকৃত প্রাণ কী তা বোঝে না। অতএব এটি সত্যিই চিন্তার বিষয়, আমাদের প্রত্যেকেরই এক্ষেত্রে নিজের অবস্থা খতিয়ে দেখতে হবে। যদি আমরা নামাযে আনন্দ পাই, বা তাউপভোগ করি, বা যদি এই দৃঢ় সংকল্প থাকে যে, আমাকে নামায উপভোগ করতে হবে, নামাযের স্বাদ পেতে হবে;তাহলে এটি কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, আমাদের কেউ রীতিমত নামায পড়বে না? সবারই এই স্বাদ এবং এই আনন্দের কোন না কোন সময় অভিজ্ঞতা হয়ে যায় বা হয়ে থাকবে। মানুষ যখন সমস্যা কবলিত হয়, তখন আমরা দেখি যে অনেকেই নামাযে ক্রন্দন করে, আকুতি-মিনতির সাথে নামায পড়ে, চলাফেরার সময়ও আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে, আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। আর এই কারণে ইবাদতেও সে মনোযোগী হয়। সারাক্ষণ তাদের হৃদয়েকোন না কোন চিন্তা থাকেই আর কিছুটা মনোযোগও সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে এমন পরিস্থিতিতে মানুষ স্থায়ীভাবে দোয়ায় লেগে থাকে। কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য যখন চরিতার্থ হয়ে যায়; যখন সমস্যা থেকে উত্তরণ হয়, তখন অনেকেই এমন আছে যাদের নামাযে মধ্যে বিনয়াবনত দোয়ার ক্ষেত্রে আলস্য চলে আসে। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ভিত্তিতে এই লক্ষ্য নিজেদের সামনে রাখতে হবে যে, অবস্থা ভালো হোক বা মন্দ, স্বচ্ছলতা হোক বা অস্বচ্ছলতা, এই স্বাদ এবং এই আনন্দ লাভের চেষ্টা করে যেতে হবে যা এক নেশারমত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। শুধু ব্যক্তিগত অবস্থা-ই নয়, বরং সমাজের সার্বিক অবস্থাও একজন মু'মিনের হৃদয়ে বেদনা সৃষ্টি করা উচিত। এই বেদনাঘন পরিস্থিতির যখন উদ্ভব হয়, তখন বেদনার সাথে দোয়াও উদ্ভূত হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাকিস্তানে জামাতের অবস্থা ভয়াবহ। চতুর্দিক থেকে জামাতের সদস্যদের বিরুদ্ধে ঘৃণার তীর নিক্ষেপ করা হচ্ছে। হিংসা এবং বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। মোল্লাদের ভয়ে বা তাদের কথায় যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে তার ফলশ্রুতিতে জামাতের সাথে যেসব অ-আহমদীর পুরনো সম্পর্ক রয়েছে, তাদের মাঝেও অনেক ক্ষেত্রে বিরোধিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোটের উপর যুলুম এবং অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে সব আহমদীর একদিকে যেমন উপভোগ্য ও আনন্দযুক্ত নামায পড়ার চেষ্টা করা উচিত, একইসাথে মসজিদ আবাদ করার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত।

সম্প্রতি খোদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তানের পক্ষ থেকে শূরার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট এসেছে যাতে তারা লিখেছেন যে, সংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে তরবিয়তী সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নে আমরা এই এই সাফল্য অর্জন করেছি। ভালো কথা, এটি উন্নতির দিকে পদচারণা। তরবিয়ত সংক্রান্ত অনেক কথার মাঝে একটি কথা ছিল আমার খুতবা জুমুআ শোনার দিকে এত হাজার খোদ্দামের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু যা চিন্তার বিষয় তা হল, বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত লোকের সংখ্যা খুতবা জুমুআর শ্রোতাদের এক তৃতীয়াংশ বা এর চেয়ে কিছুটা বেশি। অনুরূপভাবে নামাযে অভ্যস্ত বা নামাযী খোদ্দামের সংখ্যা খুতবা শোনে এমন খোদ্দামের চেয়ে অনেক কম। এমন খুতবা শুনে কী লাভ যার ফলে আল্লাহর প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয় না, আর সেই মৌলিক দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় না যা পালন করা একান্ত আবশ্যক?

তো আমি যেভাবে বলেছি, আমি দুই-তিন খুতবা পর পর বাজামা'ত নামায বা ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা করে থাকি। যদি এর কোন প্রভাব-ই না পড়ে, তাহলে শুধু সংখ্যার ঘর পূরণ করে লাভ কী? পাকিস্তানে আহমদীদের যে অবস্থার কথা আমি তুলে ধরলাম, সে অবস্থার পরও যদি আল্লাহ তা'লার প্রতি তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ না হয়, তাহলে কবে হবে? আমরা কি নাঊযুবিল্লাহ্ আল্লাহ তা'লার পরীক্ষা নিতে চাই যে, আমরা তো এমনই থাকব, আমাদের অবস্থায় পরিবর্তন আনার দায় আল্লাহ তা'লার উপর। যদি মনোবৃত্তি এমনই হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে অভিযোগের কোন যৌক্তিকতা নেই। আল্লাহ্ এটি বলেন নি যে, তোমরা যা ইচ্ছে তাই কর, আমার প্রাপ্য দাও বা না দাও, তোমরা যেহেতু মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করেছ তাই আমি তোমাদের সাফল্য দান করব। সাফল্য বা সফলতা লাভের জন্য নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থা খোদার সন্তুষ্টির অধীন করা উচিত।

খোদ্দামদের রিপোর্টের কথা আমি উল্লেখ করেছি, এর অর্থ এই নয় যে দুর্বলতা কেবল খোদ্দামদের মাঝেই বিরাজমান; আনসারেরও একই অবস্থা। তাই পাকিস্তানের সব আহমদীর এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করার প্রয়োজন রয়েছে। সফলতা ঘুমিয়ে থাকলে আসবে না; ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে সাফল্য লাভ হবে না। সাফল্য সীমান্তে ঘোড়া বাঁধা আর সেনা ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার ফলে লাভ হবে। পাকিস্তান থেকে যারা বাইরে এসেছেন, বা মোটের উপর জামা'তের সর্বত্র– এসব উন্নত বিশ্বেও আর অন্যান্য স্থানের আহমদীদের অবস্থাও একই রকম। আমরা একথা বলতে পারি না যে, বাইরে এসে মানুষ নামাযী হয়ে গেছে, বা সর্বত্র মানুষ নামাযী। জামা'তের অবস্থা যদি খতিয়ে দেখেন তাহলে সর্বত্র নামাযের ক্ষেত্রে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হবে। যদি ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিটি সংগঠন পৃথিবীর সকল দেশে আত্মবিশ্লেষণ করে, ফলাফল নিজ থেকেই সামনে এসে যাবে। কিন্তু যারা পাকিস্তানের বাইরে এসেছেন তাদেরকে বিশেষভাবে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন এর জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করা উচিত। সেই কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ এইভাবেই হবে।

কোন কোন জামা'তে নামাযের উপস্থিতি ভালো, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন না কোন ব্যক্তির কোন না কোন নামায ছুটে যাচ্ছে। কেউ কেউ এমন আছে যারা কোন কোন সময় দু'এক বেলার নামায পড়ে না, বা তাদের নামায ছুটে যায়। এর একটি কারণ, আমি যেভাবে বলেছি, এদিকে ব্যবস্থাপনা মনোযোগ বা দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। ব্যবস্থাপনাও অন্যান্য বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেয়।

প্রথমত, আমার খুতবা সবাই তো শোনেই না; একথা বলা যে, একশত ভাগ মানুষ খুতবা শুনে, এটি ভুল কথা; আর শুনলেও সবসময় স্মরণ করাতে থাকা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। ব্যবস্থাপনা এই জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেন তরবিয়তের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে।

সম্প্রতি এখানকার একটি জামা'তের মজলিসে আমেলার সাথে আমার সাক্ষাৎ ছিল; প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন যে, যখন থেকে আমি দায়িত্ব নিয়েছি, আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রতি আমরা গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করেছি আর এদিকে আমরা এখন খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি। আমি বললাম, এই যে চেষ্টা আপনি করেছেন সেটি সঠিক, কিন্তু মু'মিনের জন্য যে বিষয়টি মৌলিক এবং যা আবশ্যক অর্থাৎ নামায, এর জন্য আপনি কী চেষ্টা করেছেন? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি নীরব ছিলেন। যদিও ফজর এবং এশার নামাযের উপস্থিতি সম্পর্কে আমি যখন জিজ্ঞেস করি, খবরাখবর নেই, তো সেক্ষেত্রে পরিসংখ্যান যা সামনে এসেছে তা ভালো ছিল; কিন্তু এতে ব্যবস্থাপনার কোন ভূমিকা নেই। যদি নামাযকে উপভোগকারী নামাযী সৃষ্টি হয় তাহলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিজ থেকেই শুধরে যাবে, কেননা তাকওয়ার মান উন্নত হলেই আর্থিক কুরবানীর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। শুধু তা-ই নয়, বরং উমুরে আমা বা বিচার বিভাগের যে সমস্ত সমস্যাদি রয়েছে তাও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমাধান হয়ে যাবে; বরং বাকী বিভাগগুলোরও সংশোধন হয়ে যাবে, যদি নামায সঠিকভাবে আদায় করা হয়।

আজকাল কেবল পাকিস্তানেরই নয়, বরং পৃথিবীর সার্বিক পরিস্থিতি এমন যে, যুদ্ধ এবং ধ্বংসের আশঙ্কা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন সরকারও এ বিষয়ে আশঙ্কা ব্যক্ত করছে আর যতদূর সম্ভব কিছু ব্যবস্থাও তারা নেওয়া আরম্ভ করেছে। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় বা ঐশী নিরাপত্তাই মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারে।

অনেকে লিখে যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে কী হবে, আমাদের করণীয় কী? তাদের জন্য উত্তর হল, যদি এসব বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হয় তাহলে মসীহ্ মওউদ যেভাবে বলেছেন যে, মহাবিশ্বের মালিক প্রভুকে ভালোবাসতে হবে; আর তাঁকে ভালোবাসার একটাই রীতি– তা হল নিজেদের নামায এবং ইবাদতগুলো তাঁর নির্দেশের অধিনে আদায় করে তা উপভোগ করার ওস্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

অধিকাংশ মানুষ এসব দেশে এসে জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাচুর্য্য দেখে আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলে যায়। তাদের ধারণা অনুসারে এই স্বাচ্ছন্দ্য তাদের লাভ হয়েছে এইসব দেশের সমৃদ্ধির কল্যাণে। আর তারা মনে করে যে, 'এরা যে এত উন্নত, এরা কোন্ ইবাদত করছে?' যে কারণে কেউ কেউ এই চিন্তাও রাখে যে, 'আমরা তো এদের চেয়ে কিছুটা হলেও ভাল, যেখানে পাঁচ বেলার নামায পড়া আবশ্যক তার ভিতর থেকে দু'তিন বেলার নামায তো আমরা পড়িই'। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, যারা খোদাকে ভুলে যায়, তাদের জন্য পরিণামে শাস্তি অবধারিত। এদের অনুকরণ করবেন না। যদি খোদার শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা পেতে হয় আর আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও রক্ষা করতে হয়, তাহলে তাদের এই বাহ্যিক অবস্থাকে দেখবেন না; বরং সেই শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করুন যা আল্লাহ্ আমাদের কাছে চান।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সত্তায় ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়ার পর নামায কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব প্রত্যেক আহমদী নর -নারীর নিজেদের নামাযের হেফাজত করারআর বিশেষ করে পুরুষদের জামাতের সাথে নামায পড়ার প্রতি গভীর দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নামাযের গুরুত্ব, নামায পড়ার রীতি, নামাযের দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে তাঁকে মানার তৌফিক দিয়েছেন। কিন্তু যেভাবে আমি বললাম,তা সত্ত্বেও যদি আমরা মৌলিক শিক্ষা অনুসরণ না করি আর অন্যদের মত দু'তিন বেলা নামায পড়াকেই যথেষ্ট মনে করি, যেমনটি অধিকাংশ অ-আহমদী করে থাকে, তাহলে এই বয়আত করে কোন লাভ নেই।

নামাযের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে কোন মার্গে দেখতে চান, এই প্রেক্ষাপটে তিনি আমাদের কীভাবে বুঝিয়েছেন তা স্পষ্ট করার জন্য তাঁর কিছু উক্তি তুলে ধরছি। একজন মু'মিন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কলেমা পাঠ করে একত্ববাদের ঘোষণা দেয়, আর তৌহীদ বা একত্ববাদ কী– সেই সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন,

"অতএব স্মরণ রেখ আর খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখ, আল্লাহ্কে ব্যতীত অন্যের সামনে নতজানু হওয়া খোদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নামান্তর। তিনি (আ.) বলেন, নামায বা তৌহীদ যেটিই হোক না কেন, কেননা তৌহীদ বা একত্ববাদের ব্যবহারিক বহিঃপ্রকাশের নামই হল নামায। (মৌখিকভাবে একত্ববাদের দাবি তো করে, কিন্তু একত্ববাদের ব্যবহারিক বহিঃপ্রকাশ হল নামায।) এটি তখনই কল্যাণশূন্য হয়ে পড়ে যখন এতে আত্মবিলুপ্তি ও বিনয়ের প্রেরণা না থাকে যখন মানুষ সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্র প্রতি না নতশির হয়। শোন! সেই দোয়া, যার জন্য اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ অর্থাৎ 'আমাকে ডাক আমি উত্তর দিব' বলা হয়েছে, তার জন্য এই সত্যিকার প্রেরণাই আবশ্যক। যদি এই কাকু তি-মিনতি আর বিগলনের মাঝে সত্যিকার প্রেরণা না থাকে তাহলে তা তোতা পাখির বুলি থেকে পৃথক কোন কিছু নয়।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২

সত্যিকার প্রেরণা সৃষ্টি করা চাই, কাকুতি-মিনতি আর বিগলন সৃষ্টি করা চাই; এগুলো না থাকলে কোন লাভ নেই।

যেভাবে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, দোয়ায় বিনয় এবং বিগলন আর আকুতি-মিনতি যদি থাকে কেবল তবেই আল্লাহ তা'লার কাছে গৃহীত হয়। পুনরায় তিনি (আ.) এটিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন যে, নামাযে যে বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে যেমন- কিয়াম, রুকু, সিজদা– এই সব অবস্থা একটি ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠার চিত্র তুলে ধরে। কখনও মানুষ উঠে, কখনও বসে, কখনও সিজদা করে; এই যে ব্যাকুল বাহ্যিক অবস্থা– এগুলোর মাধ্যমে হৃদয়েও এক জ্বালা ও ব্যাকুলতা সৃষ্টি হওয়া উচিত। আর অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে সিজদা, কিয়াম, রুকু আনন্দ ও স্বাদ লাভ করা যাবে।

এরপর দাসত্বের মর্যাদা, প্রকৃত বিনয় এবং পাপকে যে নামায জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে, তার সম্পর্কে তিনি (আ.)বলেন,

''মানুষের আত্মা যখন আত্মবিলুপ্তির মূর্ত প্রতীক হয়ে যায়, নিজেকে বিলুপ্ত করে দেয়, তখন তা খোদার পানে এক ঝর্ণার মত প্রবাহিত হয়। (বিনয় সৃষ্টি হলে পরেই খোদার পানে প্রবাহিত হবে।) আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবার সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। আর তখন খোদর ভালোবাসা তার প্রতি বর্ষিত হয়।' মানুষ যখন চেষ্টার মাধ্যমে এবং আল্লাহ তা'লার কাছে কৃপাভিক্ষা চেয়ে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবার সাথে সম্পর্ক কর্তন করে, তখন আল্লাহ তা'লারভালোবাসা তার প্রতি বর্ষিত হয়। অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, 'আর যখন খোদার পক্ষ থেকে যদি এই ভালোবাসা তার প্রতি নাযেল হয় তখন পাপ ভস্মিভূত হয়ে যায়, আর নামাযে এক স্থায়ী আনন্দ সে লাভ করে।'

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:১০)

তাই এই অভিযোগ করার পরিবর্তে বা এই ধারণা হৃদয়ে স্থান দেয়ার পরিবর্তে যে নামাযে আমরা স্বাদ পাই না– আমাদের উচিত খোদার সাথে বিশেষ সম্পর্ক বন্ধন রচনার চেষ্টা করা। নিজেদের অবস্থাকে বিশ্লেষণ করুন। আমরা কি শুধু মুরগির মত ঠোকর মারছি, নাকি প্রকৃত অর্থে নামায পড়ছি? এরপর নামাযে জ্যোতি অর্জন এবং নামাযকে উপভোগ করা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি আরো বলেন যে,

''যথাবিহিত নামাযের ব্যবস্থা করা এবং রীতিমত নামায পড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেন প্রথমতঃ তা স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়। এমন এক অভ্যাসে যেন তা রূপ নেয় যা একেবারে পাকা। আর আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন এবং ফিরে আসার ধারণা যেন হৃদয়ে সব সময়ে বিরাজ করে। এই সবকিছু যদি হয়, অভ্যাস যদি পাকা হয়, তাহলে ধীরে ধীরে এমন সময় আসে যখন অন্যের সাথে পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার ফলে এক জ্যোতি এবং এক স্বাদ আর আনন্দ সে লাভ করে।" (মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:১)

মানুষ যখন অন্য সবকিছুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে খোদামুখি হয়, খোদার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করে, তখন নামায তার উপভোগ্য হয়ে উঠে।

অতএব, প্রথমে নামাযের অভ্যাস সৃষ্টি করা আবশ্যক। রীতিমত নামায পড়া আবশ্যক; বাহ্যত এর কোন কল্যাণ দৃষ্টিতে আসুক বা না আসুক, কিন্তু নামায পড়তে হবে, কেননা এটি ফরয। আর এটি এ জন্য পড়তে হবে যে, সর্বাবস্থায় আমাকে খোদামুখি থাকতে হবে, তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে, তাঁর কাছেই চাইতে হবে। এই অবিচলতা যদি স্থায়ীভাবে বিরাজ করে তাহলে এমন একটি সময় আসবে যখন নামাযের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করা হবে আর নামায উপভোগ্য হয়ে উঠবে। অনেকেই যেভাবে জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয়, তারা তখন আর এই উত্তর দিবে না যে, 'আমি নামায পড়ার চেষ্টা করি, কিন্তু অলসতার শিকার হয়ে যাই।' হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার বলেন যে, আলস্য তখনই প্রকাশ পায়, যখন নামাযের গুরুত্ব মাথায় থাকে না।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:৬-৭)

আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের মানুষ বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। যদি খোদার সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস থাকে তাহলে এটি সম্ভবই নয় যে মানুষ আলস্যের শিকার হবে। অতএব, আজকে পৃথিবী যে অবস্থার শিকার এর কুফল থেকে নিজেদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষার জন্য বিশুদ্ধ চিত্তে খোদার সামনে বিনত হওয়া আবশ্যক আর এর সর্বত্তোম উপায় যা আল্লাহ্, তাঁর রসূল (সা.) এবং এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (অযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন তা হল নিজেদের নামায আদায় করা এবং এর হেফাজতের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া।

এক জায়গায় বলেন, "স্মরণ রেখ, এই জামা'তভুক্ত হওয়ার পিছনে বস্তুবাদিতা যেন উদ্দেশ্য না হয়; বরং খোদার সন্তুষ্টি যেন লক্ষ্য হয়, কেননা এই পৃথিবীর জীবন তো কোনভাবে কেটেই যাবে। ফার্সীর একটি প্রবাদ তিনি লিখেছেন যে, রাত শীতের রাত হোক বা গ্রীষ্মের রাত- তা তো কেটেই যায়, অবস্থা ভাল হোক বা মন্দ- তা তো কেটেই যায়। এই বস্তু জগৎ এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে পৃথক রাখ, ধর্মের সাথে তাকে সম্পৃক্ত করো না। কেননা, ইহজগৎ শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু ধর্ম এবং এর প্রতিফল স্থায়ী হয়ে থাকে। এই পৃথিবীর জীবন সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। তোমরা জান প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি ক্ষণে সহস্র সহস্র মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন মহামারী এবং রোগ পৃথিবীকে ধ্বংস করছে। কখনও প্লেগ ধ্বংস করে, কখনও কলেরা; কেউ জানে না কে কত দিন জীবিত থাকবে। মৃত্যুর কথা যখন জানাই নেই যে কখন আঘাত হানবে, তখন তার সম্পর্কে উদাসীন থাকা কত বড় ভ্রান্তি! তাই পরকালের চিন্তা করা আবশ্যক। যে পরকাল সম্পর্কে চিন্তিত থাকবে, আল্লাহ্ তা'লা ইহজগতে তার প্রতি করুণাবারি বর্ষণ করবেন। খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, মানুষ যখন পূর্ণ মু'মিন হয়ে যাবে তখন আল্লাহ্ তার এবং অন্যান্যদের মাঝে একটা স্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করবেন। তাই প্রথমে মু'মিন হয়ে যাও। আর এটি তখন সম্ভব যদি বয়আতের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সাথে, যা কিনা খোদাভীতি এবং খোদার তাকওয়ার সাথে সম্পৃক্ত, তার সাথে জাগতিক লোভ এবং উদ্দেশ্যকে মিশ্রিত না কর। রীতিমত যথাসময়ে নামায পড়, তওবা-ইস্তেগফারে রত থাক, মানব জাতির প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর, কাউকে দুঃখ দিবে না, সততা এবং পবিত্রতার ক্ষেত্রে উন্নতি কর– তাহলে খোদা তা'লা সকল প্রকার কৃপাবারি বর্ষণ করবেন। মহিলাদেরকেও ঘরে নসীহত কর যেন তারা রীতিমত নামায পড়ে, তাদের অভিযোগ অনুযোগ থেকে মুক্ত রাখ, পরচর্চা থেকে বিরত রাখ, পবিত্রতা এবং সততা তাদেরকে শিক্ষা দাও। আমাদের দায়িত্ব হল কেবল বুঝানো। এটি মেনে চলার দায়িত্ব তোমাদের।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৫-১৪৬)

অন্যদেরকেও বুঝাবে, মহিলাদের বুঝাবে বা শিশুদের বুঝাবে, তবে এরজন্য প্রথমে নিজেকে পবিত্র হতে হবে ও সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। এরপর বলেন যে,

"দৈনিক পাঁচ বেলার নামাযে নিজের জন্য দোয়া কর। নিজের ভাষায় দোয়া করা নিষেধ নয়। নামায ততক্ষণ উপভোগ্য হয় না যতক্ষণ বিগলিতচিত্তে বিশেষ মনোযোগের সাথে দোয়া করা না হয়, আর এই অবস্থা ততক্ষণ লাভ হবে না যতক্ষণ বিনয় সৃষ্টি না হবে। আর বিনয় তখন সৃষ্টি হয় যখন মানুষ এটি বুঝে যে সে কী পড়ছে। তাই নিজের ভাষায় নিজের কথা বলতে গেলে আবেগ উচ্ছ্বাস এবং আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এটির এইঅর্থ করা মোটেই উচিত নয় যে, নামায নিজের ভাষায় পড়তে হবে; বরং আমার কথার অর্থ হল মসনুন দোয়া এবং যিকরে এলাহীর পর নিজের ভাষায়ও দোয়া কর; নতুবা নামাযের নির্ধারিত সঠিক বাক্যে আল্লাহ্ তা'লা একটা বরকত বা আশিষ রেখেছেন, আর নামায দোয়াকেই বলা হয়। তাই এতে দোয়া কর, যেন তিনি তোমাদেরকে ইহ এবং পারলৌকিক বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন, তোমাদের পরিণতি যেন শুভ হয় আর তোমাদের সব কাজ যেন তাঁর ইচ্ছার অধীনস্ত হয়। নিজের স্ত্রী-সন্তানের জন্য দোয়া কর, পুণ্যবান হও, সকল প্রকার পাপ এড়িয়ে চল।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৫-১৪৬)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে নামাযের হিফাজতের তৌফিক দান করুন আর রীতিমত নামায পড়ার তৌফিক দিন আর বিশুদ্ধ চিত্তে খোদার সন্তুষ্টির জন্য নামায পড়ার তৌফিক দান করুন। আমাদের নামাযে আল্লাহ্ তা'লা এক স্বাদ এবং আনন্দ রেখে দিন যেন আমরা এই ক্ষেত্রে কখনও আলস্য প্রদর্শনকারী না হই আর এই কথার প্রকৃত মর্ম যেন আমরা বুঝি যে, আজকে পৃথিবীর বিপদ-আপদ এবং সমস্যাবলী থেকে আমাদের জন্য মুক্তি পাওয়া তখন সম্ভবপর হবে যখন আমরা খোদার দাসত্বের দায়িত্ব সত্যিকার অর্থে পালন করব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 2 Thursday, 17-23 Feb, 2017 Issue No. 7-8

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

গুলো খাওয়া আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ মোস্তফা (সাঃ) পছন্দ করেন নি। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) একবার হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব (রাঃ) যিনি তার ছোট ভাই ছিলেন তাকে বলেন, বশির তুমি বল, বিদ্যা উত্তম না ধনসম্পদ?হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নিকটেই বসে ছিলেন তখন তিনি (আঃ) এই কথা শুনে বললেন, "বৎস! 'তওবা' (অনুশোচনা কর) তওবা কর। না বিদ্যা উত্তম না ধনসম্পদ খোদার দেওয়া করুনাই উত্তম। এইরূপে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) স্বয়ং ছোট ছোট পুত্র সন্তানদের মস্তিষ্কে প্রথম থেকে ধ্যান ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে যদি খোদার করুণা না হয় তাহলে বিদ্যা ও ধসসম্পদ উভয়ই কোন কাজের নয়। কোন না ঐ বিদ্যা ওধনসম্পদ দ্বারা যদি কেই মন্দ কাজ করতে থাকে তাহলে সে মন্দ হয়ে যায়। এইরূপ আর একটা ঘটনা আছে। একবার মোসলেহ মাওউদ (রাঃ) ঘরের মধ্যে পাখি ধরছিলেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "মিঞা ঘরের পাখি ধরা ঠিক নয়। যার মধ্যে দোয়া করুণা নেই তারমধ্যে ঈমান (ধর্মীয় বিশ্বাস) নেই"। এই সব বিষয় থেকে জানা যায় কত ছোট ছোট বিষয় থেকে তার শিক্ষা দীক্ষায় যত্ন নেওয়া হত।তিনি শিশুকাল থেকে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। একবার তিনি বাচ্চাদের সাথে খেলছিলেন। হযরত খলিফা আওয়াল (প্রথম খলিফা) হাকিম মৌলবী নূরুদ্দিন (রাঃ) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি(রাঃ) অতি আদরের জিজ্ঞেস করলেন, মিঞা আপনি কি খেলছেন? হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাঃ) নিমেষে উত্তর দিলেন বড় হয়ে আমিও কাজ করবো। তখন তার বয়স মাত্র চার বৎসর ছিল।এইরূপে একবার তিনি একটা ছেলের সাথে খেলছিলেন। তখন তার বয়স প্রায় নয় বৎসর। খেলতে খেলতে তিনি এইভাবে একটা বই নিয়ে খুলে দেখলেন তার মধ্যে লেখা ছিল জিব্রাঈল এখন অবতরণ করেন না। তিনি (রাঃ) বলেন এটা ভূল, আমার পিতার অবতীর্ণ হয়।সেই ছেলেটি বলে, জিব্রাঈল এখন আর আসে না, কেননা বইতে লেখা আছে। উভয়ে নিজ নিজ কথায় অনমনীয় ভাব দেখালেন। সেই ছেলেটি বলল, হযরত জিব্রাঈল এখন আল্লাহ মিঞার সংবাদ নিয়ে অসেন না। এই দিকে হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাঃ) বললেন, আসেন। দুজনে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর নিকট গেলেন এবং নিজের বিবাদের কথা বললেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন বইতে ভূল লেখা আছে। জিব্রাঈল এখনও আসেন। এই রকম অনেক ছোট ছোট বিষয় আছে যার থেকে তার ছেলে বেলার জ্ঞান বিদ্যা ও তুখোড় মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহেব ইং ১৮৯৫ সালে হাফেয আহমাদুল্লা নাগপুরি তাকে কোরআন শরীফ পড়ানো আরম্ভ করেন। ইং ৭-ই জুন ১৮৯৭সালে তার আমিন (কোরআন পাঠ করার সমাপ্তি অনুষ্ঠান) হয়। এই আমিন অনুষ্ঠানে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)একটি কবিতা লেখেন, যাতে কবিতার কিছু পংক্তি এইরূপ আছে-

কিঁউকর হো শুকর তেরা হ্যায় জো হ্যায় মেরা, তুনে হর এক করম সে ঘর ভর দিয়া হ্যায় মেরা।জব তেরা তেরা নূর আয়া জাতা রাহা আন্ধেরা,ইয়ে রোয কর মুবারক সুবহানা মাইয়্যারানী।তুনে ইয়ে দিন দেখায়া মাহমুদ পড়কে আয়া,দিল দেখকর ইয়ে এ্যাহসাঁ তেরী সনায়েঁ গায়া।সদ শুক্র হ্যায় খোদায়া, সদ শুক্র হ্যায় খোদায়া,ইয়ে রোয কর মুবারক সুবহানা মাইয়্যারানী।

অর্থাৎ কি কোরে তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি? আমার আছে যা কিছুই তা সবই তোমার। তুমি সব রকম অনুগ্রহের দ্বারা আমার গৃহ ভরে দিয়েছো। যখন নূর (জ্যোতি) এসে গেল তখন অন্ধকার নিরোহীত হলো। এই দিবসটি করো আশীসময়, সর্বতঃ পবিত্র তিনি যিনি আমায় দেখেন তুমি এমন দিন দেখিয়েছো যখন পড়ে এসেছে, এই অনুগ্রহ দেখে যে সে তোমার গুন গান করেছে। হে খোদা, শত শত কৃতজ্ঞতা তোমার, হে খোদা, শত শত কৃতজ্ঞতা তোমার। এই দিবসটি করো আশীসময় ,সর্বতঃ পবিত্র তিনি যিনি আমায় দেখেন।

শিশু গণ! এই কবিতাটি দুররে সামীন পুস্তকে আছে। আমার ধারণা তোমরাও পড়ে থাকবে। যদি না পড়ে থাক, তাহলে নিশ্চয় পড়ে নিও। তিনি (রাঃ) কিছুকাল যাবৎ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের লোয়ার প্রাইমারী স্কুল, কাদিয়ানে পড়েন। ইং ১৮৯৮ সালে তালিমুল ইসলাম স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ঐ স্কুলে ভর্তি হন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) যাদের কাছে স্কুলের শিক্ষা লাভ করেন, তাদের নাম :

১) হযরত ইয়াকুব আলি সাহেব ইরফানি (রাঃ) সম্পাদক, 'আল হাকাম' পত্রিকা (কাদিয়ান)।২) হযরত কাজী সৈয়্যেদ আমীর হোসেন সাহেব ভেরবী (রাঃ)।৩) হযরত মৌলানা সৈয়্যেদ মহম্মদ সারওয়ার শাহ সাহেব (রাঃ)।৪) হযরত মৌলানা শের আলী সাহেব (রাঃ)। ৫) হযরত মাস্টার আব্দুর রহমান সাহেব (রাঃ) (পূর্বের নাম মেহের সিং)।৬) হযরত মুফতি মহম্মদ সাদিক সাহেব (রাঃ)।৭) হযরত মাস্টার ফকিরুল্লাহ সাহেব (রাঃ) ইত্যাদি।

হযরত সৈয়্যেদ মহম্মদ সারওয়ার শাহ্ সাহেব (রাঃ) বলেন, যখন আমি হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) কে পড়াতাম, তখন একদিন আমি বললাম, মিঞা আপনার পিতার উপর তো প্রচুর ঐশী বাণী অবতীর্ণ হয়। আপনার উপর কি ঐশী বাণী অবতীর্ণ হয় ও স্বপ্ন দেখেন?তিনি উত্তর দিলেন, মৌলবী সাহেব! স্বপ্ন অনেক দেখি এবং একটা স্বপ্ন প্রতি দিনই দেখি, আমি একটা সেনা দলের সেনাপতি রূপে কাজ করছি। মৌলবী সাহেব বললেন, যখন আমি এই স্বপ্ন শুনলাম, তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, তিনি কোনোও সময় জামাতের নেতৃত্ব দান করবেন।হযরত মৌলানা শের আলী সাহেব (রাঃ) বলেন, আমি বাল্যকাল থেকে হুযুরের মধ্যে সু-অভ্যাস ও শিষ্টাচার ছাড়া কিছু দেখিনি। শিশুকাল থেকে তার মধ্যে পুণ্য ও খোদাভীতির লক্ষণ দেখা যায়।

ইং অক্টোবর, ১৯০২ সালে হযরত ডাক্তার খলিফা রশীদ উদ্দিন সাহেব (রাঃ) এর কন্যা হযরত সৈয়্যেদা মাহমুদা বেগম সাহেবার সাথে রুড়কিতে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। ইং ১৯০৩ সালে কন্যা বিদায় হয়। হযরত উম্মে নাসের সাহেবার সাত পুত্র ও দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করে।

নিম্নলিখিত তাদের নাম :-১) হযরত সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ খলিফাতুল মসীহ সালেস (রহঃ)

২) সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব
৩) সাহেবযাদা ডাক্তার মির্যা মুনাওয়ার আহমদ সাহেব
৪) সাহেবযাদা মির্যা হাফিজ আহমদ সাহেব
৫) সাহেবযাদা মির্যা আনোয়ার আহমদ সাহেব
৬) সাহেবযাদা মির্যা আজহার আহমদ সাহেব
৭) সাহেবযাদা মির্যা রফিক আহমদ সাহেব
৮) সাহেবযাদি নাসেরা বেগম সাহেবা
৯) সাহেবযাদি আমাতুল আযিয বেগম সাহেবা

ইং ২৬মে, ১৯০৮ সালে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর মৃত্যু হয় তখন মোসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর অন্তরে চিন্তা হল, এখন লোকেরা নানারকম আপত্তি উত্থাপন করবে ও জামাতের অনেক বিরোধিতা করবে। ঐ সময় তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে অঙ্গিকার করলেন "সব লোক যদি তাকে ছেড়ে চলে যায় আর আমি একা হয়ে যাব তাহলে আমি একাই সারা দুনিয়ার সাথে প্রতিদ্বন্দিতা করব ও কোনও বিরোধিতা গ্রাহ্য করব না"।

এভাবে তিনি সারা জীবন কখনও কারো শত্রুতা ও বিরুদ্ধাচারণকে গ্রাহ্য করেননি এবং সর্বদা ইসলাম ও জামাতের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে গেছেন। তার সম্বন্ধে আল্লাহ মিঞা পূর্ব্বেই বলে দিয়েছিলেন, তিনি দৃঢ় সংকল্পকারী হবেন অর্থাৎ খুব সাহসী ও অদম্য উৎসাহী হবেন এবং যে বিষয়ে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, সেটা পূর্ণ করবেন। সুতরাং যখন তিনি কোনও বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, দুনিয়া ওলট-পালট হয়ে গেলেও তিনি পূর্ণ করে ছাড়তেন।

ইং ১৯১২ সালে তিনি প্রথমে মিশর এবং পরে আরব গমন করেন ও কাবা গৃহে হজ্ব করেন। তিনি হযরত মহম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) এর বংশধরদেও সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদেরকে সেখানকার পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতার প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর মৃত্যুর পর ইং ২৭শে মে, ১৯০৮ সালে হযরত মৌলবী নুরুদ্দীন সাহেব (রাঃ) জামাতের প্রথম খলিফা নির্ব্বাচিত হন। তারপর সর্ব প্রথম হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) হযরত

খলিফাতুল মসীহ আউওয়াল (রাঃ) এর হাতে 'বয়েত' করেন। তিনি খলিফাতুল মসীহ আউওয়াল (রাঃ) এর প্রতি অত্যন্ত ভক্তি-ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করতেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর প্রতি হযরত খলিফাতুল মসীহ আউওয়াল (রাঃ) এর স্নেহ ও ভালবাসা ছিল। যখনই হযরত খলিফা আউওয়ালের মজলিসে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) আগমন করতেন, তখন তার জন্য নিজের অর্দ্ধেক তোষক খালি করে দিতেন এবং তার উপর বসার জন্য বলতেন। একটি বক্তৃতায় হযরত খলিফা আউওয়াল বলেন, "মিঞা মাহমুদ প্রাপ্ত বয়স্ক, তাকে জিজ্ঞাসা কর সে আমার খাঁটি অনুগামী। হ্যাঁ একজন বিরুদ্ধবাদী বলতে পারে আমার খাঁটি অনুগামী নয়।কিন্তু এটা নয় আমি উত্তম রূপে অবগত সে আমার খাঁটি অনুগামী এবং এমন অনুগামী যা তোমাদের মধ্যে থেকে একজনও নও"।

(ক্রমশঃ)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir